শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বক্তৃতামালা
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারের
সৌজন্যে ও সহযোগিতায়)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭২

গ্রন্থকার-পরিচিতি

এই পুস্তকটির রচয়িতা প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী থাকলেও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী হিসাবেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। কলিকাতায়, ব্রহ্মদেশে, উত্তরপ্রদেশে, আসামে, দিল্লীতে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে দামোদর ভ্যালী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন এবং বিশ্বব্যাঙ্ক হতে ঋণ সংগ্রহের জন্য ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকায় প্রেরিত হন। পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর খাস-দপ্তরে তাঁর বিশেষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও সচিব হিসাবে আমন্ত্রিত হন। তা ছাড়া বহু কমিশন ও কমিটিতে তিনি চেয়ারম্যান ও সদস্যের কাজ করেছেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ এবং বর্তমানে সেনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলের সক্রিয় সদস্য। তিনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অফ্ কালচার, শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দিরের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। তাঁর 'ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা' 'দুই কবি' (রবীন্দ্রনাথ ও শ্রী অরবিন্দ), 'উত্তর মেলেনি' 'অসমীয়া সাহিত্য', 'বসোরার উজীররা' 'The Judge', প্রভৃতি পুস্তকগুলি সুধীমহলে অভিনন্দিত। তাঁর 'Vedanta as a Social Force' এবং 'শিবভাবনা' শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। প্রতিবেশী অসমীয়া ও তামিল সাহিত্যে তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। কবি এবং গল্পলেখক হিসাবেও তাঁর সাহিত্যিক মহলে খ্যাতি আছে।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিবেদিতা' লেকচারার, 'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী' লেকচারার, 'টি পি খয়তান' লেকচারার', ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র লেকচারার,' 'রায় বাহাদুর জি সি ঘোষ লেকচারার' নিযুক্ত হন। সম্প্রতি তিনি ১৯৭২ সালের ডি, এল, রায় রিডারশিপ বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

নিবেদন

১৯৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে "কবি শ্রীঅরবিন্দ" সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ পাই। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তবে তার কিছু অংশ আমার "দুই কবি" পুস্তকে সংগৃহীত। ঐ বক্তৃতাগুলি ও পরে ১৯৭০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন লেকচার্স-এর ভিত্তিতেই "শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী" পুনর্লিখিত। এই ধ্রুপদাঙ্গ মহাকাব্যটি শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য (magnum opus) বলে চিহ্নিত। আমার আলোচনা ধারাবাহিক বিশ্লেষণ, বা পর্ব, সর্গ ও বিষয়সূচী অনুসারে ভাষ্য, টীকা বা অন্বয় নয়, শুধু কাব্যপাঠে আমার মনে যে উল্লাস জেগেছিল, কাব্যপরিণতির যে সূত্র দানা বেঁধেছিল তারই একটি ক্ষীণ পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা মাত্র। অনধিকারীর এই প্রয়াস, কাব্যরসপিপাসু হিসাবে, যোগশাস্ত্রবেত্তা বা জীবন রহস্যবিৎএর নয়। তাই ক্ষমার্হ। নিছক্ কাব্য হিসাবেও এই মহাকাব্যের ব্যঞ্জনাময় পরিধি (mystic fringe), ছন্দ, শব্দচয়ন ও রূপকল্পের বিশালতা (universali of images) স্মরণীয়। সাবিত্রী কাব্য ইংরাজীতে লেখা—সেই জন্য মূল ইংরাজী উদ্ধৃতি প্রায় অপরিহার্য। তজ্জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সংশ্লিষ্ট সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রীতিপূর্ণ সৌজন্য জানাই, বিশেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে, রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্তঅরুণ রায়কে, প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালকে ও প্রেসকর্মীদের।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী-পত্র

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী"

প্রথম উল্লাস

রাত্রির ধ্যানমৌন স্তিমিত স্তব্ধ ক্ষণে শর্বরীর বাক্যহীন জাগ্রত সভায় এক সভাকবিকে দেখেছি তাঁর নিদ্রাহীন চক্ষু নিয়ে যুগে যুগে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন।

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা কাতর
চকিত বিদ্যুৎ-রেখাবৎ
তোমার নিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ

তার পর ভোর হল রাত্রি, মন দাঁড়িয়ে উঠে বলে—আমি পূর্ণ, তার অভিষেক হল আপনারি উদ্বেল তরঙ্গে, উপচে উঠল, মিলতে চলল চারিদিকের সব কিছুর সঙ্গে!

প্রসারিত চৈতন্যের এই অনুভূতিতে কবিদের, সাধকদের, রসিকদের কণ্ঠে শুনেছি আবরণ-উন্মোচনের প্রার্থনা—বলে দাও, জানিয়ে দাও, দেখতে দাও, বুঝতে দাও, শুনতে দাও, সরিয়ে দাও এই আচ্ছাদন, তুলে নাও এই যবনিকা, জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী হও, প্রাণের নেতা চোখ দাও, অবিচ্ছেদে দেখা দিক।

দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি—
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
হেথায় নক্ষত্র যত

মহাকায় বুদ্বুদের মত—
উঠিতেছে ফুটিতেছে
সেখানে নিশান্তেযাত্রী আমি
চৈতন্য সাগর তীর্থপথে
--- --- ---
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দে অমৃতরূপে

কিন্তু কোন জানারই যে শেষ নেই, কোন চলারই যে অন্ত নেই, নির্মম সে পথ, নিরীহ সে অহংকার—শুধু ওযে দূরে, ও যে বহুদূরে—শুধু সেই উর্দ্ধের ছায়া নেমে আসছে সত্তার গভীরে—স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ-অভ্যুদয়ের মত. শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী নিয়ে, নবপ্রভাতের উদয়সীমায় রূপ ও অরূপ লোকের দ্বারে।

কবির অপূর্ব ভাষায় রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টিতে ফুটেছিল :—

অসীম আকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে
দেয়নি যে দেখা আজো কোনোখানে
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি

যুগ থেকে যুগান্তরে, কল্প থেকে কল্পান্তে, সৃষ্টির চতুর্দিকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মনে চেতনায় প্রতিনিয়ত যে আলোড়ন চলছে, যে অভিব্যক্তি ফুটছে, যে রূপ থেকে রূপান্তরে নিত্য যাওয়া-আসা হচ্ছে, সেইত মহাকালের নৃত্য বিভঙ্গ। তাকে ছন্দের বন্ধনে, ভাষার নিগড়ে, কল্পনার অপরূপ মহিমায় কাব্যরসসিঞ্চিত করা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা করলেন শ্রী অরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে। তাই এ কাব্যকে সাধারণ কাব্যের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। তথাকথিত মিষ্টিক বা মিথিকাল পোয়েট্রি ও এ নয়। এখানে অস্পষ্টতা নেই। আলোকোজ্জ্বল প্রজ্ঞা-উদ্ভাসিত মানস নিজের

চিন্তালব্ধ, ধ্যানলব্ধ, জ্ঞানলব্ধ অনুভূতিরই বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে, মহাভারতের একটি কাহিনীকে (legend) সাধনায় প্রতীক (symbol) করে নিয়ে। তাই অনেকের মতে "সাবিত্রী" কাব্যই নয়। তার ভাব, তার ভাষা, তার উপমা, তার বাক্যসম্ভার, তার ছন্দোবদ্ধতা (Rhythm Structure), তার রচনাশৈলী সবই বক্তব্যের উপযোগী হয়েছে বলেই এই কাব্যকে বলা হয়েছে গুরুগম্ভীর এপিক্‌ধর্মী। এখানে শুধু সাহিত্যের কল্পনা নেই, আছে দর্শনের বিন্যাস, সাধনার একাগ্রতা—ত্রিকালের ত্রিকায়, অনন্তের রাজ্য, অনির্বাণের পথ, অচিন্ত্যনীয়ের সুর। ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে সাবিত্রীর গল্পাখ্যান সুন্দর ও মনোরম হলেও এবং পূর্বপরিচিত ট্রাডিশনের সঙ্গে যুক্ত হলেও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়, কারণ আমাদের সময় নেই, মন নেই, আর নেই মনের সেই উত্তুঙ্গী আভিজাত্য—এ হচ্ছে অচেনা পথের কথা—একে সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে সেই পথের পথিক হতে হয়—যে ছবি আঁকা হচ্ছে তার সঙ্গে একান্ত হতে হয়। তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন—the truths it expresses are unfamiliar to the ordinary mind or belong to untrodden domain or enter into a field of intuitive experience. It expresses a vision by identity, by entering into it.

"সাবিত্রী" সম্বন্ধে তাই বলা যেতে পারে যে কবির দিব্য-জীবনের বিবর্তন ও বিবর্ধনের সঙ্গে এই কাব্যও গড়ে উঠেছে, বেড়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই কাব্য লেখা হয়েছে, বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ সাবিত্রী সত্যবানের এই গল্পটি তাঁর কবিচেতনায় বহুদিন থেকেই ঘুরপাক্ খাচ্ছিল। ১৮৯৮-৯৯ সালে এর প্রথম কল্পনা। ১৯১৩ সালে দেখি যে তিনি স্বরচিত "সাবিত্রী" কবিতা পড়ছেন। ব্যাসের সাবিত্রী তাঁকে শুধু মুগ্ধ করেনি, অভিভূতও করেছিল—There has been only one who could give us a Savitri. তাই এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে ভাবরসে সমৃদ্ধ করে সাধনলব্ধ রূপ দিয়ে তপস্যাপূত চিত্র এঁকে কবি এক মহাসম্পদ এনে দিলেন। বিভ্রান্ত সমালোচক বললেন—he thinks too much—বড্ড বেশী চিন্তা, বড্ড বেশী কসরৎ—বড্ড বেশী কল্পিত। এখানে আছে "more than mere logical language addressed to the intellect—ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের গণ্ডীতে বাঁধা বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার কাছে এই আর্জি পেশ নয়, এখানে তার চেয়েও বেশী প্রাপ্তি আছে। নীরদবরণের সঙ্গে

সান্ধ্য-বৈঠকে শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন যে বারো বার সংশোধন করে তবে প্রথমপর্ব শেষ করেছিলেন তিনি। Mother এর আশ্রমে আসবার পূর্বেই এই কাব্যের পত্তন হয়। অবশ্য এতদিন ধরে লেখায় কিছু কিছু variation of tone থাকতে বাধ্য। আর তাঁর নিজের কথাতেই বলি, ভাষা হার মানছে ভাবের কাছে—মালার্মের মত ভাবের উপর ভাব আসছে, (thought upon thought) ভাষার উপর ভাষা, উপমার পর উপমা। বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে বিচার করবার আগেই মন দিয়েই বোঝা হয়ে গেছে। কাব্যের জগৎ শুধু যে ইয়েটসের কথায় তন্দ্রাময় জগৎ তা না (a record of a state of trance)। এ হচ্ছে অনুভূতিময় প্রকাশময় চিন্ময় জগৎ ও। একত্রীকৃত (integrated) সত্তার আত্মউন্মীলনও।

সাবিত্রীর কাহিনী মহাভারতের। নিঃসন্তান অশ্বপতি সন্তানকামনায় তপস্যায় বসলেন। তাঁর সিদ্ধিলাভ হলো। জগৎজননী তার কন্যারূপে অবতীর্ণ হলেন। সেই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে দ্যুমৎসেন পুত্র সত্যবান্‌কে কামনা করলে। নারদ এসে সাবধান করে দিলেন যে এই সত্যবান্ স্বল্পায়ু, বিবাহের এক বৎসর পরেই এর মৃত্যু অবধারিত। সব জেনেও, নিয়তির এই নির্দেশ নিয়েও সাবিত্রী স্বেচ্ছায় এই বন্ধন পরলেন—তারপর বিধিনির্দ্দিষ্ট দিনে অরণ্যের গভীর সমারোহের মাঝখানে, শ্যামশ্রীর দ্যোতনার মধ্যেই মৃত্যু এসে নিয়ে গেলো সত্যবান্‌কে। সাবিত্রী চললেন, পিছু পিছু, যমের সঙ্গে তর্ক করলেন, তাকে বোঝালেন— মৃত্যুর উপরে অমৃতময়ী জয়ী হলেন, নিয়মের (অর্থাৎ যমের) নিগড় ভাঙলেন—ফিরে পেলেন তার স্বামীকে, তার দয়িতকে। এই কাহিনীকে কবি শ্রী অরবিন্দ কি রকম ভাবে অপরূপ কল্পনায় ও কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করে মানুষের চিরন্তনী সাধনার প্রতীক করে দিলেন তারই আভাস 'সাবিত্রীতে'।

কাব্য আরম্ভ হলো এক দিব্য উন্মেষের চেতনায়। জ্যোতিষাং জ্যোতি। জাগৃহি জননী—জাগো, জাগো—ভোরের শুকপাখী ডাকে—জাগরণের লগ্ন এসেছে। সামনে পিছনে উর্দ্ধে অধে সব ঘিরে সব নিয়ে কালো অন্ধকার—একটা জমাট নিরেট কালো, কায়াহীন রূপহীন বোবা তিমির নিবিড় অচেতনা। সেই নৈঃশব্দের মহাসাগরে মহাতামসী শুয়ে আছেন—তারই গর্ভে আছে আলো। এখানে রূপ নেই, রস নেই, শূন্য, মহাশূন্য—নিঃসীম নিথর স্তব্ধতা। তখনও অসীম সীমার বন্ধনে ধরা দেননি, তখনও অনাদ্যন্তবান্ সান্তের রূপ নেননি, পদ্মনাভ

তখনও অনন্ত শয্যায়, তখনও ধ্যানমগ্ন মহাদেব, তিন-কাল ত্রিনয়ন মেলি দিগ্-দিগন্তর দেখেননি, জগতের আদি অন্ত থরথর কেঁপে ওঠেনি। মহাতামসী বসে আছেন, মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরা—কালনিরোধজন্যা, কাল-ভয়বারিণী সেই তারিণী, মহাকালের (Time space, continunum) হৃদি পরে যিনি পা রেখেছেন, যে পরাশক্তি। কে তিনি, কী তিনি, তার রূপ কী, তার সংজ্ঞা কী—সবই যে তন্দ্রাতুরা—কিন্তু সে তন্দ্রা সৃষ্টিমুখী (creative slumber)। তাই বুঝি সাধক গান গায়—

নিবিড় আঁধারে তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী

কিন্তু দিশাহারা সেই অন্ধকারের মাঝে স্পন্দন জেগে ওঠে—নতুন সৃষ্টির বেদনা। সমাধিস্থ শিবের কি যোগভঙ্গ সুরু হলো—নামহীন অচিন্তনীয়ের আবেগ উথলে উঠছে—কি যে হবে তা কেউ জানে না—কিন্তু ভোরের আগের প্রহরই যে দেবতাদের জাগৃতির লগ্ন—তন্ত্রে বলে রাতের শেষ প্রহরই যে কালীর রাত—মহাতিনিশায় সাধককে যে তাই বসতে হয় তার শবাসনে, বীরাচারী দিব্যাচারী—চতুর্দিক আলো করে মা নামবেন—শুধু বর আর অভয় নিয়ে নয়, শুধু শক্তি আর মুক্তি নিয়ে নয়, ভক্তি ও প্রেম নিয়েও—সর্বাঙ্গীণ সাধনাই যে আলোর সাধনা, অমৃতের সাধনা—অন্ধকারকে চলে যেতে হয়, মৃত্যু হয়ে ওঠে অমৃত। তাই বাণী উঠলো—অনাহত সে ধ্বনি—তমসঃ পরস্তাৎ—আসছেন, তিনি আসছেন—আকাশের দিকে দিকে প্রতিটি রন্ধ্রে সেই শুভ্রতার আভাস, সেই দিব্যদ্যুতির পরশ—রাত্রির গভীর তিমির ভেদ করে মহাতামসীর গর্ভ হতে, মহাকালীর কোল হতে তিনি আসছেন—আলোর দেবতা—পরম অভ্যুদয়—বহ্নিমান্, দীপ্তিমান্, জ্ঞানবান্, রূপময়, প্রকাশময়, সেই ভদ্র—সেই ময়োভব সেই ময়স্কর, সেই অনন্ধকার। অনালোকিত অনন্তের মন্দিরে (unlit temple of eternity) দীপ জ্বলে উঠলো। কবির কল্পনা এই উপমাটিকে গ্রহণ করলে—কারণ প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের সঙ্গে এই ঘটনাটি (across path of the divine event) আমাদের জীবনে অচেছদ্য ও তাই সহজবোধ্য। আমাদের এই স্থূল পৃথিবীর জগতে প্রতিদিন ভোর হচেছ, আলো নামছে, দীপ্ত কৃপাণ হস্তে সপ্তাশ্ববাহিত দেবতা বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্ত কেশে উদ্‌বোধনী বাণী শোনাচেছন—

আলোকের বর্ণে বর্ণে নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়ন করিছে আহ্বান, আমার মনের জগতেও, বুদ্ধির ক্ষেত্রেও, বোধির পরিবেশেও এই অন্ধকার, এই কালো, এই সংশয়, এই বেদনা, বিরোধ বিবাদ বিতণ্ডা। সেখানেও আমরা কর্মক্লান্ত জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার থেকে চাইছি একটু আলোর রেখা, একটু বোধির দীপ্তি, একটু বিজ্ঞানের প্রভাস। এই জাগা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এই জাগরণ মহাপ্রকৃতির জগতেও চলছে, বিশ্বাতীত জগতেও সেই ধারা—মহাসতীর গর্ভ হতে জাগবেন মহাবিষ্ণু পরমশিব। বিবশ বিশ্ব চেতনায় জাগবে। মায়ের কোলে যেন একটি অজ্ঞান শিশু বসে—সে চাইছে আশ্রয়, সে চাইছে বুকের অমৃত, সে চাইছে অজ্ঞানের মাঝে একটু আলো। হ্যাঁ, কালোর ভেদ হলো (insensibly somewhere a breach began) তারপরেই একটু রং, একটু আলো—পতনোন্মুখ কালোর বহির্বাস গেলো ছিঁড়ে—আলোর বন্যা ছড়িয়ে গেলো, ছাপিয়ে গেলো দিকে দিগন্তরে—হলো এক জ্যোতির্ময় উন্মেষ। দ্রুত পরিবর্তনশীল চিত্রলেখার (Rapid series of transitions) মধ্য দিয়ে কবি নিয়ে গেলেন তার সোনার তরীটিকে। বৃহদারণ্যকের ঋষির মত খুলতে লাগলেন তার ঝাঁপিটি—আবরণ উন্মোচনের পালা। কালের গহ্বরে, অন্ধকারের গভীরে, সীমাহীন শূন্যে, অভীপ্সার অগ্নি এসে লাগলো স্ফুলিঙ্গেষ প্রকাশ হলো একটি চিন্তার কণা, জন্ম নিলে নতুন এক অনুভূতি, কাঁপতে লাগলো একটি হারানো স্মৃতি—

এ যে অনেকদিনের, অনেকদূরের, বিস্মৃত অতীতের পদধ্বনি। এ যেন রবীন্দ্রনাথের

কোন দূরের মানুষ এল যেন কাছে
তিমির আড়ালে, নীরবে দাঁড়ায়ে আছে
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি

শ্রীঅরবিন্দের শেষের কবিতাতেও পড়ি এই কথা—

কোন ছায়াঘন প্রত্যুষের আলোতে
কোন বিস্মৃত সায়াহ্নের ধূসর প্রাঙ্গণে
দয়িততম তুমি আসো
দীপশিখা সম

আনন্দ স্বপন মম
তুমি আসো, আরো, আরো, নিকটে আরো—
(In some faint dawn
In some dim eve,
Like a gesture of light
Like a dream of delight
Thou comest nearer, nearer to me.)

কিছুই হারায় না, কিছুরই বিলুপ্তি নেই—আছে, সব আছে, পরমের মধ্যে বিলীন হয়ে আছে। তাকে নব স্বীকৃতিতে, নব রূপায়ণে, নব জাগরণে বিভাসিত করাই হলো সাধনা, এ সাধনা শুধু মানুষের একার নয়, মহাপ্রকৃতিরও, ভাগবতী সত্তারও, পশুপক্ষীকীট আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যে জগৎ তারও, বিরাট বিপুল যে বিশ্ব, তার প্রতিটি অণুতে রেণুতে এই সাধনা চলেছে, এই আলোড়ন বলছে তোমায় নিজের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে ফিরে আসতে হবে আবার মায়ের কোলে—যিনি ছড়িয়ে পড়েছেন তিনিই গুটিয়ে নিচ্ছেন Return of the Spirit to itself. যোগ মানেই যুক্ত হওয়া, সাধনার সেই পন্থা। যে ধারা স্মৃতি মুছে গেছে, (had blotted the crowded truths of the part) তাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলো, নতুন করে সৌধ গড়ে তোলো। মাভৈঃ অভীঃ—সবই সম্ভব যদি ঊর্দ্ধের পরশ থাকে।

আশা জাগছে, পৃথিবীর বুকে, মানুষের মনে আর বিশ্বসত্তার নির্জ্ঞান অন্ধকারের মাঝে—ও সবই যে এক সুরে বাঁধা, এক তারে সাধা, সুর-জ্ঞানস্তিমিত বলেই অসুর জেগে ওঠেন। এখানে নিত্যরাস, মনে বনে বৃন্দাবনে এক হয়ে গেলেই সেই আলো জাগে, চোখ খোলে—সৃষ্টিদৃষ্টি এক হয়–তখন আর প্রশ্ন করতে হয়না কে জানে কে তুমি—চিরকালের সেই চিরন্তনী জিজ্ঞাসা—

কো অদ্ধা বেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আতা কুজাত ইয়ং বিসৃষ্টি:
অর্ধাগ দেবা অস্য বিসর্জনেন যা কো বেদ যত আবভূব। বেদের ঋষি যে প্রশ্ন করেছিলেন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞ যাকে অবিজানতাং বললেন, আজকের কবিও পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যাতেও সে প্রশ্নের উত্তর পেলেন না—কো বেদঃ। চরম প্রশ্নের উত্তর হয়ত নেই–কারণ যাকে নিয়ে উত্তর, তিনিই যে অনন্ত, তিনিই সীমাহীন, তিনি যে বিজ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত মিলিয়ে—তবু সাধকের চিন্তায় মরণের অতীত স্তরে যে একটা সুদৃঢ়

প্রতীতি আসতে পারে তারই পরিচয় বহন করে নিয়ে চলেছে শ্রী অরবিন্দের সাবিত্রী।

হে মাধবী দ্বিধা কেন—র মত আলোকলতার যে দ্বিধা ছিল তাও মুছে গেল। প্রথমে যা ছিল একটু জ্যোতির্ময় কোণ (lucent corner) তাই হয়ে উঠলো আলোর বন্যা। আলোকের ঝরণা ধারায় ধুয়ে গেল যেন সব। মহাভাস্বর মহাদীপ্ত মহাসৌম্য মহেশ্বর মহাকাল ধীরে ধীরে তিমির বন্ধন থেকে জেগে উঠলেন। বৈদিক কবি দিন ও রাত্রির সংগ্রামের মধ্যেই এই উষাকে দেখেছিলেন, জাগিয়েছিলেন, প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শাশ্বত আর নশ্বরের মাঝে, আলো আর অন্ধকারের মাঝে দূতী তিনি। তিনি মঘোনী, তিনি রিতাবরী, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—আছেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝে। স্বর্গের প্রখর দীপ্তিকে তিনি দেখিয়ে দেন, তারপর ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে যান। কিন্তু মুছে গেল কী সেই মহা বিস্ময়, নির্মল নির্ভয়, দিব্য অভ্যুদয়, শুধুই কী প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ, জীবনের খরবেগ, তার অশান্ত প্রবাহ, অসন্তুষ্টি, অতৃপ্তি—গ্যয়টের ভাষায়—(walpurgis night,) কেবলই কী আমি বলবো, আমি আর পারছি না, আমার ভাল লাগছেনা, আমার বর্তমানে আমি সন্তুষ্ট নই, আমার অতীতে আমি তৃপ্ত নই, আমার ভবিষ্যৎ আমার কাছে অস্পষ্ট। উষা কিন্তু দিয়ে যায় মহান্ ভবিষ্যতের আভাস, বৃহতের, মহতের মহত্তমের বীজ হয় বপন। সাধারণ মানুষ আমরা বলি—কী হবে আমার অন্ধ অতীতে, যে অতীতে ইতিহাস হয়ে গেছি আমি—কী হবে আমার ভবিষ্যতে, যে ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাবে আমার সঙ্গে। সাবিত্রীর কবি আশ্বাস দিচ্ছেন—না, না, তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সব একই কালচক্রে বাঁধা, একই সূত্রে গাঁথা—তোমার যাত্রা নিত্য—তার শেষ নেই—তোমায় চলতে হবে রূপ থেকে রূপে, পথ থেকে পথে, স্তর থেকে স্তরান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে, অনুভূতির অনন্ত রাস্তা দিয়ে—তবেই তোমার ঊর্ধ্বাশী মানবাত্মার শান্তি—অশ্বপতি ত তুমি—তোমারই যোগ—এগিয়ে যাওয়া—মহীদাস তুমি এগিয়ে চলো—আত্মসিদ্ধির যোগ ত সেইখানে---পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে, শিখরের পর শিখর—চরৈবেতে

তাহারি অন্তর মাঝে
ঊর্দ্ধ পানে উঠিয়াছে

উজ্জ্বল স্বর্ণ গিরি
সূর্যসম বিচ্ছুরিত কাঞ্চন শিখর (নিশিকান্ত)

মানুষ অতৃপ্ত সন্ধানী–(Insatiate Seeker)–সে সহজ উন্মত্ত, সে বোধিচিত্ত–তার জ্ঞানপিপাসা, রূপপিপাসা, রসপিপাসা অদম্য—তার জীবনের বহিরঙ্গে কর্ম-শেষই শেষ কথা নয়—বাইরের নামসংকীর্তন যেদিন সমাপ্ত হবে সেদিন অন্তরঙ্গ রসাস্বাদন সুরু হবে তা সত্য, বাইরের কপাট বন্ধ হলে ভিতরের কপাট খুলবে সে কথাও ঠিক, কিন্তু ভিতর ও বাহির এক হয়ে যাওয়া চাই—শুধু চেতনার মূর্তিতে নয়, চেতনার ব্যাপ্তিতে, চেতনার সমত্বে। বিশ্বোত্তীর্ণ আর বিশ্ব যে একই–উজিয়ে যাওয়া যেমন চাই, ভাটিয়ে আসাও তেমনি দরকার। এই বিরাটের পটভূমিকায় সহায় যে তিনিই, তাই ত স্বেচ্ছায় এই জোয়াল তুলে নেওয়া, মানবসত্তার ভার–lifted up the burden of his fate এই তো আত্মাহুতি, আত্ম-তর্পণ, আত্ম-বিসর্জন। ত্বাং ধ্যায়ন্ মূঢ়চেতা অপি কবিঃ। মহাপ্রকৃতির এই বিলোপের কথা চিন্তা করলে মূঢ়রাও কবি হয়ে ওঠে। কারণ এই পৃথিবীই হবে দিব্যের আধার। তার বীজ ত আছে নিহিত সেইখানে—পৃথ্বীসত্তার রূপান্তর কাম্য। বারে বারে জ্ঞানী-গুণী মহাজন সে আলোক পেয়েছেন, বুঝেছেন—জেনেছেন, অমৃত কলস ভর্তি অমিয় এসেছে—কিন্তু মন-মন্থনে বিষ নিঃশেষ হয়নি, অজ্ঞান মন তার সাম্রাজ্য ফিরে পেয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সে শক্তি কার্যকরী হলেও সমষ্টিগত রূপায়ণে সে বারে বারে হটে গেছে, ফিরে গেছে। অমরতার স্পর্শ মরতার জগৎ সইতে পারেনি। আগুন এসেছে, পুরোহিত অগ্রণী অগ্নি তার শিখা জ্বেলেছেন, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে—কিন্তু গ্রহীতার আধার বিশুদ্ধ নয় বলে শুধু কয়েকজনই সে আগুনের স্পর্শ পেয়েছেন; কিন্তু অজ্ঞান এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে—নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। পিছনে পিছনে দুঃখ এসেছে, মৃত্যু এসেছে, খণ্ডতা এসেছে, বিচার বৈকল্য এসেছে, মলিন আবরণ পরতে হয়েছে। আত্মার এই যে দুর্দিন, এই যে দুঃখ তাপ শোক, নাশ, তবু সে ত সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেনা—পৃথ্বীসত্তার একদিক ত উর্ধ্বের দিকে—তার এক কোটিতে সীমা, আর এক কোটিতে অসীম—মানবসত্তার মধ্যেও ত দেবসত্তা নিহিত, সর্বব্যাপী যিনি, সর্বগত যিনি তার সঙ্গে যুক্ত। তার চেয়েও বড় কথা হচ্চে—

The Universe Mother's love was hers—পৃথ্বীসত্তা পেয়েছে সেই মহামায়ার প্রীতি, তার ভালবাসা। অজ্ঞান আর নিয়তির ছদ্মাবরণে মর্ত্যের ক্লান্তি, অবসাদ আর গ্লানির মাঝখানে সেই অমৃত ও অমর্ত্যেরই ইঙ্গিত। তাই এই সবুজ-মেখলা পরা বসুন্ধরা বেদনার অর্ঘ নিয়ে দাঁড়ালো বিশ্ব-মাতার ছন্দকে মূর্ত করতে। আনন্দের মহাযজ্ঞে তারও নিমন্ত্রণ, প্রেমঘন অভয় হস্ত প্রসারিত হলো পৃথ্বীসত্তার দিকে। সাবিত্রী জাগলেন—দৃষ্টিপাত করলেন। প্রতিটি পলে গাঁথা মহাকাশ কালসীমায় পদভার রেখে চলেছেন—কালাগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে অবোধ জীবরা কলরব করছে—সাবিত্রী জগদ্ধিতায় ব্রত নিলেন—মহান্ নেত্রীত্বের সাথে, মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে বজ্রের আলোতে।

Her Soul arose confronting Time and Fate
Immobile in herself, She gathered force.

ভাগ্যবিধাতার লিপিকে অগ্রাহ্য করে দুর্ভাগ্যের সামনে দাঁড়াতে পারে কোন শক্তিমতী। বিধিলিপির বিধানকে উল্টে দিতে পারে কোন পরমা, কোন জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী, কবির কল্পনার সাবিত্রীই তিনি। নিষ্ক্রিয় যিনি, তিনি সক্রিয় হলেন—যিনি কালাতীতা তিনি কালের বন্ধন মেনে নিলেন, তার সঙ্গে তর্ক করলেন, কালজয়ী হলেন, প্রেমের শক্তি দিয়ে তপস্যার মুক্তি দিয়ে, জীবনের ভুক্তি দিয়ে। সাবিত্রী বলে-ছিলেন—মৃত্যুদেব আমি তোমাকে স্বীকার করি না, মৃত্যু মানেই খণ্ডতা—মৃত্যু মানেই দ্বৈতকে স্বীকার, মৃত্যু যখন জিজ্ঞাসা করলে—কিসের শক্তিতে তুমি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন বিধানকে উল্টে দিতে চাও নারী? সাবিত্রী বলেছিলেন—প্রেমের ঠাকুরই আমার দেবতা, (My God is Love, Swiftly Suffers all) আমিই ত দুঃখ ভোগ করছি, আমি জাগরী, আমি ক্রন্দসী, আমি রাণী, আমি গরবিনী, আমি দাসী, আমি নির্য্যাতিতা, আমি প্রেমিকা, আমি সেবিকা। আমার ঠাকুর ঐ মাটিতেও আছেন, ঐ আকাশেও আছেন, দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ। সেদিন কালপুরুষকে হঠতে হয়েছিল—কারণ সেদিন সাবিত্রী দাঁড়িয়েছিলেন তপ্ত ক্লান্ত, আতুর পৃথ্বীর প্রতিনিধি হয়ে।

I am a deputy of the aspiring world
My spirit's liberty I ask for all

দাও, দাও, ফিরিয়ে দাও, মুক্তিকামী মানুষের মনকে ফিরিয়ে দাও—সেই ত সত্যবান্—সত্যে সে বিধৃত। তাই সাবিত্রী জেগে উঠলেন—কোনদিন—না যেদিন সত্যবানের মৃত্যু হবে। অবশ্য মৃত্যু প্রাণেরই একটি ভঙ্গিমা। প্রাণের অন্নময় ভূমি থেকে যে বিদায় নিয়েছে তাকে যমের অর্থাৎ নিয়ম চক্রের নিগড় থেকে ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞানময় আনন্দময় ভূমিতে স্বস্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ করার যে সাধনা সেই হচ্ছে সাবিত্রীর তপস্যা। অশ্বপতির যোগে পেলাম উন্মুখী মানুষের উর্ধ্বারোহণের বিচিত্র কাহিনী—তার চলার বিরাম নেই, যাত্রার শেষ নেই, অনন্ত অগ্নিময় রথে সে যাত্রা—প্রতিটি পদবিন্যাসে পরিণতির সম্ভাবনা—কতো দেবতা, কতো সাধনা, কতো সিদ্ধি, কতো প্রাপ্তি, কতো জ্ঞান, কতো রূপ, কতো লাস্য, কতো রূপাতীত, কতো জ্ঞানাতীত–স্তরের পর স্তর-উর্ধ্বে, উর্ধ্বে, উর্ধ্বে–আরো আরো, আলোর পর আলো, তারপর পৌঁছলেন সেই উৎসে—সেখানে দুই এক—এক দুই। তান্ত্রিকের সাধনায় শিবশক্তির যুক্ত বিন্যাসে শক্তি প্রবল, শিব স্থাণু—রাধাকৃষ্ণের প্রেমে রাধাভাবই প্রবল, কৃষ্ণ আকর্ষণ করলেও আবিষ্ট হলেও। বৌদ্ধ চিন্তায় প্রজ্ঞার সঙ্গে সংসারের মিলনে একটি দিক্ অচল (static) কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানে শিব আর শক্তি দুই-ই সচল (dynamic,), সাংখ্যের পুরুষের মত নিষ্ক্রিয় নয়, কারণ মূলে দুই-এর পিছনে আছেন এক অনির্বচনীয়।

মানুষের মধ্যে যে দ্বৈত সত্তা আছে, বেদনা তারই অন্ধকার দিকের প্রতিভূ। হাতুড়ি পিটিয়ে যেমন লোহাকে ঠিক করতে হয়, সোনাকে অলংকার করে তুলতে হয়—তেমনি দুঃখের হোমানলে, বেদনার বহ্নিতে নিজেকে পিটে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়। এটা হোল একদিকে—আর একদিকে হচ্ছে ভাগবতী লীলার দিক্, তিনি স্বেচ্ছায় এই অজ্ঞানের আবরণ পরেছেন, সীমার জগতে ঢুকেছেন কেন—এটা হচ্ছে তাঁর অভিব্যক্তির স্বরূপ।

মৃত্যুকে জয় করাই সাবিত্রীর যোগ। তাঁর নিজের আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়েই তিনি মৃত্যুর বিরুদ্ধে অমৃতত্বের যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই আত্মশক্তি প্রেমের ঘনীভূত শক্তি এবং সেই প্রেম শুধু মানবীয় প্রেমের প্রতীক নয়—সর্বার্থসাধক সর্ব্বাস্তিমূলক ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য বিশ্বানুগ এক অখণ্ড ভাবের দ্যোতক। তবু দুটো বাধা অতিক্রম করতে হয়—শক্তি এলেই প্রেম আসেনা, জ্ঞান আসেনা, এলেও বিশুদ্ধ পরিণতি নিয়ে আসেনা—

আর প্রেমের ঐশ্বর্য এলেও শক্তির স্ফুরণ না হলে অত্যাচার অনাচার থেকে পৃথ্বীসত্তাকে রক্ষা করা যায়না।

সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী তাঁর জীবনের মিশন্‌কে রূপায়িত করবার সুযোগ পেলেন—মৃত্যু তাকে নেত্রীত্বের লোভ দেখালে, সংসার সমাজ সেবার লোভ দেখালে, আত্মমুক্তির লোভ দেখালে—কি হবে আর এগিয়ে—পৃথিবীতে সবই তুচ্ছ, সবই মরণশীল—কিছুই থাকে না। সাবিত্রী বললেন ভুল—এই পৃথিবীই দিব্যের কাছে Wager wonderful for a divine game, এই খেলায় যোগ দিতে হবে সকলকেই, মৃত্যুর লেজ খসাতেই হবে—তখনই দেখা যাবে সে হচ্ছে ছদ্মবেশী বৃদ্ধ, অমৃতেরই এপিঠ আর ওপিঠ। অশ্বপতির যোগে তিনি দ্রষ্টাপুরুষ, তিনি চলেছেন, দেখেছেন—বুঝেছেন। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ, চৈতন্যঘন বিরাট যে মানসের অতীত তাঁকে যে নামতে হবে, সে সোনার কাঠির পরশে একজনকে বিশ্বাত্মলীন হলে চলবেনা—পরশপাথর ছুঁইয়ে দিতে হবে সব খ্যাপাদের। অশ্বপতির যোগ সেই উর্দ্ধগত দিব্যকে (transcendent Divine) চেয়েছে—সাবিত্রীর যোগ তাকে নামিয়ে আনতে চেয়েছে পৃথিবীতে—ব্যক্তিগত সত্তা থেকে বিশ্বগত সত্তায়—

এই আশার বাণীই শোনালেন শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু আমরা শুনতে চাইনা, বুঝতে চাইনা। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—

সময় হলে রাজার মত এসে
জানিয়ে কেন দাওনি আমায় প্রবল তোমার দাবী
ভেঙে যদি ফেলতে ঘরের চাবী
ধূলার পরে মাথা আমার দিতাম লুটিয়ে
গর্ব আমার অর্ঘ হোত পায়ে।

দ্বিতীয় উল্লাস

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—যৌবন বেদনারসে উচছল, জীবন অরণ্যের বন্দনমর্ম্মরে একটি অপূর্ব বাণী উঠলো এক কবি মনীষীর কণ্ঠে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে—

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান
মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত

এই অতিপরিচিত অপূর্ব কবিতাটি যখনই পড়ি, তখনই ভাবি, কোন্ মহৎকে, বৃহৎকে কেন্দ্র করে কবিমনীষীর এই পুরুষোত্তম সাধনা, কার তরে কবির এই সর্ব্বোত্তম বাণী সংকল্প, আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান, সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় অমেয় আশার উল্লাস, যিনি জেগে আছেন পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন, যার জন্য আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে। কে সে? কোন পথ, কোন মত, কি সে, শ্রীঅরবিন্দ কি তারই প্রতীক—সাবিত্রী কোন ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলেছে?

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট মর্ত্যকায়ায় যাঁকে দেখি, ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁরই মহাপরিনির্বাণ। এই আবির্ভাব ও তিরোভাবের দুই কোটির মাঝখানে ১৮৭২—৭৯ সাত বছর বাল্য ও কৈশোরের যুগ, ১৮৭৯—৯৩ এই চৌদ্দ বছর বিলাতে প্রবাস বা শিক্ষার যুগ, ১৮৯৩—১৯০৬ বরোদাবাস বা অন্তর প্রস্তুতির যুগ, ১৯০৬—১০ এই চার বছর কলিকাতাবাস বা কর্ম্মযোগীর যুগ, আর ১৯১০—৫০ এই চল্লিশ বছর পণ্ডিচেরীতে আত্মসমাহিতির যুগ, এই সীমার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছেন মানুষ ও স্বাদেশিক অরবিন্দ, কবি ও দার্শনিক অরবিন্দ, সাধক ও যোগী অরবিন্দ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ তখন পশ্চিমের জোয়ারে ডুবুডুবু—নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার জন্য তার চিত্ত শুধু আকুল নয়। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যদর্শন, তাঁর চিন্তার ধারা, তাঁর রাষ্ট্রবোধের কল্পনা, তার ইতিহাস

ভাষা তাকে ব্যাকুল করছে, উন্মথিত করছে, উন্মোচিত করছে, উদ্বেলিত করছে। এই প্রবল আলোড়নের তপ্ত কটাহে ভেসে যাচ্ছে শুধু ডিরোজিয়ো রিচার্ডসনের ছাত্ররাই নয়, কিছু উপরতলার লোকও, ভেঙে পড়ছে অনেকদিনের সমাজবিন্যাসের রীতিনীতি, চিন্তাচেতনার সূত্র। মিল, বেন্থাম, কাঁতকোঁত, ডারুইন, ল্যামার্ক, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে বাংলায় তখন হাবুডুবু খাচ্ছে, ছুটছে পাদ্রীর দল প্রভু যীশুর নাম নিয়ে। এই যুগেরই একটি মানুষ ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, মনীষী রাজনারায়ণের জামাতা—তাঁরই তৃতীয় পুত্র শ্রী অরবিন্দ। নিজের ছেলে-মেয়েদের সম্পূর্ণ রূপে সাহেব করে তুলবেন এই ছিল তাঁর আশা, তাঁর আকাঙক্ষা, তার স্বপ্ন। তাই ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় চিন্তাধারা, ভারতীয় হাবভাব থেকে বিচ্যুত করে দার্জিলিং-এ কনভেণ্টে পড়িয়ে সাত বছর বয়সে তিনি বিলেতে রেখে এলেন শ্রীঅরবিন্দকে। কিন্তু চৌদ্দ বছর পরে যে মানুষটা আই,সি,এস, পাশ করেও ঘোড়া চড়ার পরীক্ষা না দিয়ে ঐ দেবদুর্লভ চাকরী না নিয়ে ফিরে এলো, সে বম্বের এ্যাপোলো বন্দরে দেশের মাটিতে পা দিয়ে দেখলে একটি ভূমাময়ীর অঞ্চল পাতা এক অচঞ্চলা মূর্তিকে, সে ভারতবর্ষ ভোগ ভূমি নয়। আর নামগ্রাসী আকার গ্রাসী সব পরিচয় গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যেই বসে আছেন, এক স্তব্ধ, এক বৃহৎ, এক মহৎ, তাঁরই রজতগিরি শৃঙ্গমালায় সমাসীন যিনি, তিনিই শিব, ময়োভব, ময়োস্কর, তাঁরই সমূদ্র তটের বিলোল বীচিবল্লরীতে যিনি প্রতীক্ষমাণা, তিনিই কন্যা, তিনিই কুমারী, ভক্তি, মুক্তি শক্তি ভবানী। তখনই তার মনে যুগচেতনার তিনটি সূত্র রূপ নিয়েছে।

১। প্রাচীন ভারতের ধ্যান ও মন, তপ ও তপস্যাকে বর্জন না করা,

২। পশ্চিমের ধাক্কা খাওয়া চেতনার সংশয়ে ও সন্দেহে সব কিছু যাচাই করে নেওয়ার প্রয়াস, সংকল্প ও সাধনা,

৩। ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল হয়ে এক মহান্ সিদ্ধান্ত সমন্বয় ও সিদ্ধির আভাস,

তার সামগ্রিক মূলকেন্দ্র থেকে রাজনীতিক শ্রী অরবিন্দকে যাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান তাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে সম্পূর্ণ ভাবে পেতে পারেন না, বিপ্লবী বিদ্রোহী শ্রী অরবিন্দ ও তাই অনাসক্ত অপ্রমত্তযোগী,

ধ্যানী, কবি, মনীষী। স্বদেশ তাঁর কাছে জরপদার্থ নয়, কতকগুলো মাঠ, বন, পর্বত, নদী নয়—স্বদেশ তাঁর কাছে মা, মার বুকের উপর বসে যদি কোন রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করে, না—সে মাকে উদ্ধার করতে দৌড়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মনের অকুণ্ঠ প্রণাম জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মবান্ধব নামকরণ করেছিলেন "মানস সরোবরের অরবিন্দ।" রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শুধু ভাব সাধনাতেই এককালে মিলন ছিল তা নয়, কাব্য জগতেও তাঁরা সহধর্মী। জীবন দর্শনেও তাঁরা a wayfarer towards the same goal, আমরা জানি যে, ১৯০৬ সালে শ্রী অরবিন্দ চলেছেন জোড়াসাঁকোয় কবির নিমন্ত্রণে—জাপানী ওকাকুরা, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য জগদীশ এবং আরো কয়েকজন আমন্ত্রিত ডিনারে। কবিকেও দেখি বহুবার চলেছেন সঞ্জীবনীর অফিসে। 'বন্দে মাতরমের' মকদ্দমায় ছাড়া পাওয়ার পর শ্রী অরবিন্দকে মুক্তিলাভের জন্য অভিনন্দন জানাতে কবি উপস্থিত, গিয়ে বলেন—আপনি আমাদের বড্ড ফাঁকি দিলেন। শ্রী অরবিন্দ ইংরাজীতে জবাব দিলেন—'নট ফর লঙ'—বেশিদিনের জন্য নয়, একটু ধৈর্য ধরুন। এই সাক্ষাতের একটা সুন্দর ছবি পাই আমরা চারু দত্তের কাছে—"অরবিন্দ ছাড়া পাওয়ার দিন দুই বাদে একদিন দুপুরবেলা আমরা—অরবিন্দ, ওঁর মেজদা, সুবোধ, নীরদ ও আমি – খুব হৈ হৈ করছি এমন সময় দরোয়ান এসে বললে—রবিবাবু এসেছেন। আমরা তাড়াতাড়ি সামনের হলে বেরিয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ দুই বাহু প্রসারিত করে অরবিন্দকে বুকে টেনে নিলেন, কবির চোখ দুটি ছলছল করছিল।"

বিশ বছর পরেও যখন শ্রী অরবিন্দকে রাজনীতি থেকে এস্‌কেপিষ্ট বলছে কেউ কেউ, তখনও কবি লিখছেন—প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। কবি আরও বললেন, ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায়, মানুষের গৌরব বোধকে জাগ্রত করে। এই সাক্ষাৎ কবিকে যে কি রকম অভিভূত করেছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীমতী মহলানবীশ।

শ্রী অরবিন্দের বাল্য জীবনের কথা আমরা সকলেই জানি, যেকয়দিন তিনি এদেশে কাটিয়েছিলেন সে কয়দিন তাঁকে আই,সি,এস—এর

মহামহিমময় ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করবার উদ্যোগে উঠেপড়ে লেগেছিলেন তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। তাঁকে পড়ানো হয়েছিল ইংরাজী স্কুলে, দার্জিলিং এ লরেটো কনভেন্টে, তারপর সাত বছর বয়সে তিনি গেলেন হোমে বা বিলাতে যাতে তিনি উপযুক্ত আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়ে সুশিক্ষালাভ করেন। চৌদ্দবছর ধরে তিনি বিলাতে রইলেন– মাঞ্চেষ্টারের গ্রামার স্কুল থেকে লন্ডনের সেণ্ট পলস থেকে কেমব্রিজের কিংস কলেজে– –সেখান থেকে আই,সি,এস, পরীক্ষা দিলেন, লোভনীয় চাকরীর আশ্বাস পেলেন, কিন্তু রঙীন হাতিয়ার হাতে নকল ঘোড় সওয়ার হওয়া হলো না তাঁর, কারণ তিনি দিলেন না ঐ ঘোড়াচড়ার পরীক্ষা। কেন তিনি পরীক্ষা দেননি বা দিতে চাননি বা পারেননি সে কথার নানা ভাষ্য আছে– তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ সম্বলিত ভাষ্য পুরাণীর লেখাতে পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক যে তাঁর কেম্ব্রিজের থাকার সময় তিনি ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁরই সহপাঠী বিচক্রফ্‌ট্‌ সাহেব আলিপুর বোমার মামলায় তাঁরই বিচার করেছিলেন। আর একজন সতীর্থ (পার্শী মিড) লিখেছিলেন চারু দত্তকে– "আমার সময়ে কেম্ব্রিজে এক আশ্চর্য ইণ্ডিয়ান ছাত্র ছিল, নাম অরবিন্দ একুয়েড ঘোষ—ভারী চমৎকার লোক, পড়াশুনাতে অনেক সাহায্য পেতাম তাঁর কাছে———।"

শ্রী অরবিন্দ ভারতে ফিরে এলেন ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বরোদায় চাকরী নিয়ে। তাঁরও পূর্ব্বে তিনি লোটাস অ্যান্ড ড্যাগার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কেম্ব্রিজের ভারতীয় মজলিসে গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর পিতার প্রেরিত বেঙ্গলী কাগজ পড়েই তাঁর মনে এগারো বছর বয়সেই দেশের জন্য কিছু করা উচিত এই প্রেরণা জাগে, এমনকি বিলাতে থাকাকালেই ম্যাক্স মূলারের "স্যেকরেড বুকস্‌ অব্‌ দি ইষ্ট' পড়ে তাঁর মনে 'আত্মা' ও বেদান্তের কথা জাগে। তখন ও বিবেকানন্দের "প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত" এর কথা তাঁর কানে যায়নি। বঙ্কিমের মহাপ্রয়াণ হলো ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে। সবে বিলাত থেকে ফিরেছেন বাইশ বছরের যুবক– –বরোদায় বাণীর সাধনায় বসেছেন অন্তরের নির্দেশে—এক তরুণ তাপস নিজেকে প্রস্তুত করছেন বৃহত্তম পরিণতির জন্য, গভীরতম অনুভূতির জন্য। তিনি তখনই তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে বঙ্কিমের মন্ত্রকে চিনে নিয়েছেন। তাই কবি শ্রী অরবিন্দ লিখলেন—হে বঙ্গজননী, কাঁদো কাঁদো। তাঁর বঙ্কিম—প্রশস্তি শুধু মুগ্ধ তরুণের রোমাণ্টিক ভাবগদগদ বাক্যবিলাস নয়–

তিনি লিখলেন—হে আমার মধুর বাংলার শ্যাম বনানী নদী– গিরি কন্দর ফুলের দেশ, প্রেমের দেশ, জাগ্রত বসন্তের বার্তাবহের দেশ, তোমার অন্তরের গূঢ় কথাটি বঙ্কিম আহরণ করেছিলেন, তিনি জেনেছিলেন তোমার সৌন্দর্য ও দেবত্বের বিভূতি, দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিলিয়ে যে মাতৃকল্পনা, তাই তাঁর মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম্'—বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, ত্বং হি দুর্গা। শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব দুর্গাস্তোত্রে আমরা পড়ি, বীরমার্গপ্রদর্শিনী এসো, আর বিসর্জন করিব না, আমাদের অখিল জীবনে অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্বকর্ম অবিরত পবিত্র প্রেমময় মাতৃসেবাব্রত হউক, কারণ এখানে:

Every image made divine
In our temple is but thine

সবই যে মায়ের মন্দির, ভবানীর মন্দির, বঙ্কিম দিলেন পবিত্র মন্ত্র, বিবেকানন্দ দেখলেন 'কালী দি মাদার', শ্রী অরবিন্দও দেখলেন সেই আলুলায়িতকুন্তলা, মেঘাঙ্গীকে

Dark as a thundering cloud with streaming hair ....obscuring heaven and in her sovereign grasp.... the sword, the flower. রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতেও ভেসেছিল— 'ডানহাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাতে করে শংকাহরণ'। বাংলার বাইরেও বাংলার ভাবধারায় পুষ্ট মহাকালীর সাধক শ্রী সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে মনে পড়ে—

তুমি বাক্ অপরূপ বাদিনী
অরাতি দমনে কলুষ নাশনে চলেছো ত্রিশূলধারিণী

* * * *

ভিদুখলাই, ভিদুখলাই, ভিদুখলাই
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।

আর একজন মহাকবি (কবি ভল্লথোল) গাইলেন—
ভবানী—এই আমার খড়্গ, খড়্গ,
তো নয় সে যে

কত যুগের কত হোমের শিখা,
এই যে, আমার জন্মভূমি, এই যে আমার বুকে
ভারতবর্ষ—রাজর্ষিদের প্রোষিতভর্তৃকা।
(অলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদ)

১৮৯৪ সালে "বঙ্কিম" সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ আর তার পূর্বে কংগ্রেসকে নিয়ে বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশে সাতটি প্রবন্ধ "নিউ ল্যাম্পস্ ফর দি ওল্ড" "পুরাতন প্রদীপের বদলে জ্বেলে দাও নবদীপালি মালা" তাঁকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলে এমনভাবে যে স্বয়ং রানাডেকে এগিয়ে আসতে হলো প্রতিবাদ করতে। তার পরের কয়েক বছর তাঁকে প্রকাশ্য-ভাবে কোন রাজনীতিতে যোগ দিতে বা এমন কি প্রবন্ধ লিখতেও দেখা যায়না। তিনি শুধু পড়ছেন, লিখছেন, বেদ বেদান্ত তন্ত্র কিছুই বাদ যাচ্ছে না—দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে শুনেছি আমরা, যে প্যাকিং কেস ভর্তি হয়ে তাঁর কাছে বই যেতো। জ্ঞান—তপস্বী সাধক-কবি নাট্যকার বাণীর তপস্যায় বসেছেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে অগ্নিকে তিনি লালন করতেন অগ্নিমীলে পুরোহিতের মত, তারই কর্মসূচী হিসাবে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দ্দিষ্ট কার্যভার দিয়ে তিনি বাংলা দেশে পাঠান—উদ্দেশ্যে দেশকে প্রস্তুত করা এক বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য। কিন্তু তখন ও তাঁর ধারণা যে এই কাজে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর লাগবে। শুধু ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা নিছক বিপ্লবাদর্শ প্রচার করা নয়, সাংস্কৃতিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি বিধান ও তত্ত্বভাবভাবিত কর্মী সংগ্রহ ও ছিল এই কার্যসূচীর অন্যতম পন্থা। স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাব এই আন্দোলনকে আরো সক্রিয় করে তুলেছিল, কারণ শুধু বিদ্রোহ প্রচারে লোকের মন তেমন সাড়া দেয়নি। জন সাধারণকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, জনগণমনকে সংহত করা, গঠন করা প্রথমে দরকার তার পরের কাজ হলো প্রকাশ্যে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন। ব্যারিষ্টার পি মিত্রের পরিচালনায় একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ্, ডন সোসাইটি, পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্, নিবেদিতার Band of despair—(অগ্রগামী মরিয়া দল), স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনা, সবই সেই যুগের চিন্তাধারার বহিরঙ্গ ফল, যার ভাবরাজ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। তাছাড়া শ্রী অরবিন্দ

শুধু ভাবের রাজ্যেই এঁদের সাথী ছিলেন না—জাতীয়তার অন্যতম পুরোহিত হিসাবে, বিপ্লবীদের কর্তা, অ্যাগ্রেসিভ ন্যাশনালিজমের পুরোধা হলেন তিনি। তাঁর উত্থান ও তিরোধান এক বিস্ময়কর ঘটনা, যা ঘটেছিল ১৯০৬—১৯০৭, ১৯০৮—১৯০৯। এই চার বছরেই শ্রী অরবিন্দের তথাকথিত পলিটিকাল লাইফের চরম সৃষ্টি। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্, কর্মযোগিন্, ধর্ম প্রভৃতি কাগজের পাতায় পাতায় সে আগুন, সে তীব্রতা, সে তেজ, সে বীর্য ছড়ানো। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শিখাময়ী লোকমাতা নিবেদিতা, অশ্বিনী দত্ত ও তিলক, খাপর্দে, লাজপত প্রভৃতি নেতারা তখন শ্রী অরবিন্দকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধের কর্মধারা নিয়েছেন। বাংলাদেশে সে এক অপূর্ব উন্মাদনার যুগ।

এর পূর্বে আর একটি জিনিস বলে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে "ভবানী মন্দির" নামে একটি পরিকল্পনার লিপি ঘুরত ঘরে ঘরে কর্মীদের হাতে হাতে। শ্রী অরবিন্দের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। সেদিনকার বিপ্লববাদের ইতিহাসে বা দেশাত্ম-বোধী গণচেতনার অধ্যায়ে এবং অরবিন্দ চিন্তার বিবর্তনে এই দলিলটির মূল্য অপরিসীম। শ্রী অরবিন্দের স্বাদেশিকতার মূল উৎস এখানে পরিস্ফুট। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ বলে এই প্রবন্ধের আরম্ভ। মায়ের নামে মন্দির গড়বেন মায়ের ভক্তরা সন্তানরা। তাঁরা পেয়েছেন আদেশ—ভগবান্ রামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন মন্দির গড়ো। একদিকে ধ্বংসের চিতাচুল্লী, নরকরোটিপূর্ণ মহাশ্মশান, অন্যদিকে নবজীবন—একদিকে সংহারের খড়্গ, আর একদিকে বরাভয়। সেই মহাশক্তির নামকরণ করলেন শ্রী অরবিন্দ, বললেন—ইনিই মাতা, ইনিই দেশ, ইনিই স্বর্গ, ইনিই ভবানী—আজ জীবনের সর্বপর্যায়ে এই শক্তির অবতরণই দরকার—সাধনাও আজ হবে শক্তির। কিন্তু সাধক শ্রী অরবিন্দের এই জ্ঞানও আছে যে, সেই শক্তি যেন বলদর্পিত না হয়, ভোগমত্ত না হয়, লোভী লালসাতুর না হয়, প্রজ্ঞাহীন, শ্রদ্ধাহীন আনন্দহীন না হয়।

এই ভবানী কে—কখনও তিনি মহাভাবে ভাবিতা মহাপ্রেমিকা, কখনো তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা বিজ্ঞানময়ী মহাচেতনা, কখনো তিনি ত্যাগ, কখনো তিনি করুণা। তিনিই মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী, মহেশ্বরী। এই মহাশক্তিকেই আমরা নানাভাবে নানারূপে স্মরণ করি, বরণ করি। তিনিই

দুর্গা, তিনিই কালী, 'অনয়ারাধিতো রাধা', সৃষ্টিস্থিতি বিনাশিনী সত্তাভূতা সনাতনী। শরতের শুক্লপক্ষে তাঁকে আমরা আবাহন করি ষড়ৈশ্বর্যময়ী বিশ্বজন মনোলোভা মূর্তিরূপে, সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে যিনি সর্বার্থ সাধিকা। আবার নিবিড় অমার তিমির রাতে তিনিই কালিকা, নগ্নিকা, ভূষণহীনা, ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী। যিনি সৌম্যা সৌম্যতরা, যিনি অন্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী তিনিই আবার মহাকালের বক্ষের উপরে নৃত্যপরা উন্মাদিনী ললজিহ্বা মহাভীমা, সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড তাঁর হাতে। শ্রী অরবিন্দ লিখলেন—এস, মায়ের ডাক শোনো—আহ্বান এসেছে, তিনি তো আছেন আমাদের হৃৎকমলে পূজার জন্য, দেখা দেবার জন্য, পরিস্ফুট হবার জন্য। সেই ভাগবতী শক্তি যে তমসাচ্ছন্ন, তাইতো তাঁর কাজ হচ্ছে না—তাঁর সন্তানরা যে তাঁকে ডাকছে না, সাহায্য চাইছে না। তুমি যদি শুনে থাক তাঁর ডাক, তোমার বুকে যদি গুমরে উঠে থাকে তাঁর পদধ্বনি, তবে ছিঁড়ে ফেলে দাও তোমার স্বার্থের কালো পর্দা, ভেঙে ফেলো আলস্যের অহমিকার অচলায়তন—ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর—মাতৃপূজার অঙ্গণে এস সবাই—যে যা পারো তাই নিয়ে এসো—যেটুকু সাধ্য পূজা কর তাঁর, দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, অর্থ দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, প্রার্থনা দিয়ে—ফিরে যেয়োনা—বরপুত্র সঙ্ঘ বিরাজ হে—তিনি আরো বললেন যে—

চেয়ে দেখ সর্বভূতে শক্তিরূপেই তিনি অবস্থিতা—আজ যদি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করো—দেখতে পাবে, দিকে দিকে শক্তির স্তম্ভ—যুদ্ধের শক্তি, অর্থের শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি, এরই মধ্যে আছে বিস্ফোরণের দাহিকা, চূর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে এই বিশ্ব, পশ্চিম তার সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে জেগেছে, জাপানে হয়েছে জাগরণ। এই ম্লেচ্ছ শক্তির মধ্যে বিকশিত হয়েছে মায়ের তামসিক ও রাজসিক শক্তি, কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকার সাত্ত্বিক শক্তিও জাগবে, যেখানে থাকবে ত্যাগের পূত অগ্নিশিখা, আত্মদানের পর্ব। কিন্তু ভারতবর্ষে এই কাজ হচ্ছে ধীরে—ভারত মাতা উঠতে চাইছেন—কিন্তু বৃথাই সে ক্রন্দন—কাজ হচ্ছে না—দুর্বলতা আমাদের অন্তর্নিহিত—আমরা শক্তিকে ত্যাগ করেছি, শক্তি ও আমাদের ত্যাগ করেছেন। বলা হয় যে, আজকে বিজ্ঞানকেই শিক্ষার বাহন করে নিতে হবে। সে কথা সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের শক্তি রাক্ষসের হাতে ভীমসেনের গদার মত। দুর্বলতায় সে তা তুলতে পারে না, তার চাপে

নিজেই মারা পড়ে। শ্রী অরবিন্দের কথায়—Bhakti is the leaping, flame, Shakti is the fuel, ভক্তি হচ্ছে উর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা, শক্তি হচ্ছে তার ইন্ধন। তাই "ভবানী মন্দিরের" আবেদনে বলা হলো—ভারতবর্ষের মূল অভাব—শক্তির অভাব, শক্তি পূজাই কাম্য, এই বৃদ্ধ ক্লান্ত শ্রমবিমুখ পরপদলেহী ভারতবর্ষকে নব যৌবন দান করতে হবে। ভারতবর্ষ হবে শক্তিমান্, বীর্যবান্, নির্লোভ, তপস্বী, জ্ঞানী—মহাসমুদ্রের মত কখনও শান্ত ধীর কখনও বা শক্তির লীলাতে চঞ্চল, তার এক হাতে থাকবে শংকাহরণ মন্ত্র আর এক হাতে খড়্গ, একদিকে বরাভয় আর একদিকে অসিখর্পর।

ভারতবর্ষের নবজন্ম চাই, এই পুনর্জাগৃতি সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন।

It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work ever given to a race that Bhagawan Ramkrishna came and Vivekananda preached.

এই বিরাট বিচিত্র কর্মযজ্ঞের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান্ রামকৃষ্ণ, এরই জন্য প্রচারে বেরিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এর পরেই এলো স্বদেশী যুগের মন ভোলানো প্রাণমাতানো সেই আন্দোলন—কিভাবে শুধু সেকালের শিক্ষিত মনকে নয় জনসাধারণকেও হাটে—মাঠে-বাজারে এই স্বদেশী যুগ পরিপ্লাবিত করেছিল তার ইতিহাস আজ রূপকথার সামিল। রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর পরিচয়, শ্রী অরবিন্দের ভাব সাধনায় তাঁর রূপায়ণ। তার পরে আস্তে আস্তে সেই গনসংযোগের মোড় ফিরলো—গুপ্ত সমিতির কথা ও কাহিনী আজকের বক্তব্য নয়—হিংসার পন্থা স্বাদেশিকতার ইতিহাসকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে বিষয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু তার পিছনে যে বিশাল প্রাণ জন্ম নিয়েছিল তার গভীরতার, তার বেদনার, তার আত্মোৎসর্গের পরিমাপ করবে কে? শ্রী অরবিন্দকেও সেখানে আমরা দেখেছি—স্তব্ধ শান্ত সমাহিত অচঞ্চল। চারুদত্ত তাঁর নামকরণ করেছিলেন গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনের 'কর্তা'। অনেক দিন পরে তাঁরই এক ভক্ত শ্রদ্ধেয় নীরদ-বরণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বিদ্রোহী দলের নেতা ছিলেন কিনা। তিনি বললেন, "আমি সে দলের প্রতিষ্ঠাতাও নই, নেতাও নই, পি,মিত্র এবং

মিস্ ঘোষাল, ওকাকুরার মন্ত্রণায় ও প্রেরণায় ছেলেরা তা আরম্ভ করে। আমি বাংলায় গিয়ে তাদের এই কাজ সম্বন্ধে জানতে পাই। তখন থেকে আমি শুধু খবর রাখতাম। আর এরা যা করত, তা নিতান্ত ছেলেমানুষী, যেমন ম্যাজিষ্ট্রেটকে মার ধোর করা। ওগুলো মোটেই আমার মতানুযায়ী নয়, উদ্দেশ্য ও ছিলনা," (শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা পৃ: ৫১)। তার পরে এলো আলিপুর বোমা মামলায় শ্রী অরবিন্দের বিচার ও মুক্তি। আলিপুর জেলেই তাঁর চিন্তাধারার ও কর্মপ্রবণতার পরিবর্তন ঘটে এ বিষয়ে সকলেই জানেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মামলার কাহিনীও সবাই পড়েছেন। শ্রী অরবিন্দের পক্ষে তার প্রতিনিধি হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সেই কম্বুকণ্ঠের উদাত্ত সুর আজও ধ্বনিত—(If it is suggested that I preached the ideal of freedom to my country which is against the law, I plead guilty to the charge..... If it is an offence to preach the ideal of freedom, I admit having done it....I have never disputed it. It is for that I have given up all the prospect of my life..... It has been the one thought of my working hours, the dreams of my sleep)—যদি বলা হয় যে আমি আমার দেশের স্বাধীনতা চাই সেটা আইনবিরুদ্ধ হোক্ তাতে কিছু যায় আসেনা। আমি বলি—আমি সেই অপরাধে অপরাধী – যদি তার প্রচার করা রীতিবিরুদ্ধ হয় আমি সে দোষেও দোষী—আমি সেই জন্যই আমার জীবন উৎসর্গ—ধনমান যশ উচ্চাসন ত্যাগ করেছি, আমার জ্ঞানত জীবনের ঐ এক ধ্যান, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। তাইতো চিত্তরঞ্জন তাকে অভিহিত করেছিলেন দেশপ্রেমের কবি, স্বদেশিকতার মানবতার উদ্‌গাতা।

সাবিত্রীর কবি শ্রী অরবিন্দকে বুঝতে গেলে আরও দুটি জিনিষ বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত যে মানুষের পূর্ণতা সমগ্রতায় উদ্ভাসিত (in its integrality) অর্থাৎ জীবনকে খন্ড করে (Compartmentalise) দেখা যায়না—যাকে আমাদের আজকের মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলি খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব (split personality)। শ্রী অরবিন্দ কবি, শ্রী অরবিন্দ সাধক, যোগী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, দেশহিতব্রতী, বিপ্লবী এ সবই হচ্ছে তাঁকে খণ্ডভাবে দর্শন, কিন্তু মূল চেতনা এক ও অখণ্ড। সাহিত্যিক হিসাবেও

তিনি শুধু কবি নন। দর্শন সম্বন্ধীয় ও রাজনীতির মতামত সম্পর্কে গ্রন্থকার তিনি, তিনি Social Philosophy-র উদ্‌গাতা, তিনি সমালোচনাসাহিত্যে একজন অত্যন্ত উঁচুদরের শিল্পী—তাঁর Future poetry বা ঐ ধরনের লেখাগুলি তীক্ষ্ণ মনন, বিচার বিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। সাহিত্যের দৃষ্টিতে শ্রী অরবিন্দের এই দান অসামান্য—এক গল্প উপন্যাস ছাড়া (গল্পও তিনি লিখেছিলেন) সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই তাঁর ছিল অনন্য পারদর্শিতা, গভীর নিষ্ঠা। কাব্য নাট্য, দার্শনিক ব্যাখ্যা, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, সমালোচনা-সাহিত্য শ্রী অরবিন্দকে সাহিত্য জগতের এক দিক্‌পাল রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত করে। তাছাড়া একটি কথা আমাদের স্পষ্ট করে মনে রাখা দরকার যে শ্রী অরবিন্দের মানসগঠনে শুধু ইংরাজী বা ফ্রেঞ্চ, গ্রীক বা লাতিনই প্রভাব বিস্তার করেনি, আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, সাহিত্য, কাব্য বিশেষ স্থান পেয়েছে। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রী মদ্ভগবদ্‌গীতা যেমন তাকে উদ্বেলিত করেছে তেমনি করেছে ব্যাস বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি কবিরা। শুধু সেকালের নয় একালেরও, যেমন বঙ্কিম, মধুসূদন—এমনকি রবীন্দ্রনাথও! ১৮৯৪ সালে ২২ বছরের তরুণ অরবিন্দ বঙ্কিমের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে লিখলেন—"Young Bengal gets its ideas, feelings and culture not from schools and colleges but from Bankim's novels and Rabindranath Tagore's poems ; So true is it that the language is the life of a nation." নব্য বাংলা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাঠ নেয়—স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ শ্রী অরবিন্দকে বলেছিলেন—তুমিত শুধু বন্ধু নও, দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি—দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়, সেই পূর্ণ অধিকার চেয়েছিলে। সে যুগে তাঁর আবির্ভাব, যে যুগ বিস্তারের যুগ, বিশ্লেষণের যুগ, বিপ্লবের যুগ। বাঙালী তখন বিশ্বরূপ দেখছে অর্থাৎ তার জাতীয় জীবনে বাহির দুয়ারের কপাট খুলছে, প্রতীচীর দুর্বার শক্তি তাকে ধাক্কা দিচেছ, নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন, নতুন রস, নতুন চিন্তা, নতুন আলোক। যে পশ্চিমের জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করছে, তার বাস্তবকে গ্রহণ করছে—সে এক অপূর্ব সমীকরণের যুগ। বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁর কথাগুলি মনে রাখবার মত—

And when posterity comes to crown with her praise

the makers of India, she will place her most splendid laurel not on the sweeting temples of a place hunting politician nor on the narrow forehead of a noisy social reformer but on the serene brow of that most gracious Bengali who never clamoured for places or power but did his work in silence for love of his work even as Nature does and just because he had no aim but to give out the best that was in him, was able to create, a language, a literature and a nation. পদলোলুপ রাজনৈতিক বা বাক্যবাগীশ সংস্কারকের গলায় সেদিন বরমাল্য পড়েনি, অনাগত মহাকাল তাঁকেই বরণ করেছে যিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে সৃষ্টির কাজ করে গেছেন, তাঁর অন্তরের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি, যে স্রষ্টা সৃষ্টি করে গেছেন, একটি ভাষা, একটি সাহিত্য একটি জাতি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা অনেকেই জানেন না যে শ্রীযুক্ত গোখলের নামে প্রচলিত "what Bengal thinks today, India thinks tomorrow" উক্তির বহু পূর্ব্বে তরুণ অরবিন্দ বলেছিলেন—what Bengal thinks tomorrow, India will be thinking tomorrow week (Sri Aurobindo—Bankim Ch. Chatterjee p. 38) ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে সেন্টপলস্ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় Wordsworth এর To the Cuckoo আবৃত্তি করে এসে তিনি সেই রাত্রেই নিজে এক কবিতা লিখলেন যার প্রথম চরণ হোল—Sounds of the awakening world—পৃথিবী জাগচে, ঘুম ভাঙচে, তাঁরই পদধ্বনি শুনছেন কোকিলের ডাকে। শ্রী অরবিন্দের প্রকাশিত কবিতাবলীর মধ্যে এইটিই আদিসৃষ্টি। মনে পড়ছে রবীন্দ্র চেতনার প্রথম উন্মেষে অমল কমল কোরকের মত উদ্ভাসিত হৃদয়ের গান—এই ঘুম জাগানিয়ার গান—

শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
দেখো তোমার দুয়ার পরে
সখী, এসেছে তোমার রবি

সেইদিন থেকে আরম্ভ করে তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত তিনি একটানা কবিতা লিখে চললেন—প্রায় রবীন্দ্রনাথের মত—একজন ইংরাজীতে একজন বাংলায়। তাঁর ভাবে ভাষায় ঝংকারে বর্ণবৈচিত্র্যে উপমায় শুধু যে তথ্য ও তত্ত্বেরই সমাবেশ দেখি তা নয়, একটা আন্তর অনুভূতির স্পর্শ পাই,। কোকিলের ডাকে যে বালক কবি জেগেছিলেন, সারা জীবনের সাধনার পর সেই চির তরুণ কবিই অমেয় আশার বাণী শুনিয়ে গেলেন, সাধকের অসংশয়িত কণ্ঠে—রাত্রির বুকের ভিতরেই আছে বৃহত্তর আলোর সাধনা "a greater dawn".

———

তৃতীয় উল্লাস

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর বিখ্যাত 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতাটি লেখেন, মনে হয় তখন তিনি তাঁর অবচেতনে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রতীককে খুঁজছিলেন, পেয়ে গেলেন ব্যক্ত অরবিন্দের ব্যক্তিত্বের রূপকে, তিনি দেখেছিলেন স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তিকে, এক তপস্যার আসনে. যাকে তিনি নূতন করে পেলেন বহুদিন পরে. অপ্রগল্ভ স্তব্ধতায়. যৌবনের অভিঘাত ও প্রাণের চাঞ্চল্য ছাড়িয়ে। আমরা রবীন্দ্রনাথ নই. সেই সৃষ্টি করা দৃষ্টি নেই. আমরা কোন্ অরবিন্দকে খুঁজবো. কোন্ ত্যাগীকে. যোগীকে. ভোগীকে, কোন্ তীক্ষ্ণধী—সাহিত্য রসিক ভাবুক সমাজতত্ত্ব-বিদ্‌কে. না দেশহিতপ্রাণ বিপ্লবীকে. শ্রদ্ধেয় চারু দত্তর কথায় "কর্তা" অরবিন্দকে. না লার্ট এণ্ড্রু ফ্রেজারের ভাষায় "পাগল" অরবিন্দকে. যিনি আই. সি. এস, হতে হতে হলেন না, যাঁর সম্বন্ধে তাঁর কেম্ব্রিজের সহপাঠীরা শুধু কৌতূহলী নয়, সশ্রদ্ধও ছিল। তাই প্রশ্ন ওঠে কোন্ অরবিন্দকে আমি বুঝি. তাঁর কাছে আমার কোন প্রত্যাশার নিবিড়তা, কোন বিরাট্ মননের বিচার. কোন ব্যক্তি স্বরূপের অভাবনীয় রহস্যের উদ্‌ঘাটন, কোন্ 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত' ভাব ও ভাবনার বিশ্লেষণ. কোন্ কল্পনার বিলাস, কোন্ পূর্ণযোগের তথ্য ও তত্ত্বলাভের প্রয়াস। কোন্ দেবতাকে তিনি পেয়েছিলেন. কোন্ মহতের পরশ তিনি রেখে গেছেন তাঁর লেখায়. তাঁর চিন্তায়, তাঁর কাব্যে. তাঁর যোগলব্ধ দৃষ্টিতে—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?
তোর অথিক গুরু. পথিক গুরু, গুরু অগণন
গুরু যে তোর বরণ ডালা. গুরু যে তোর মরণজ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা (যে) ঝরায় দু'নয়ন
কারে প্রণাম করবি মন?

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলা যায় যে, জীবনের যেটা চরম

তাৎপর্য যা তার নিহিতার্থ, যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্ছে তাকে বুঝতে পারছি প্রাণের অন্তরতর প্রাণ বলে। এই পুঢ়মনু প্রবিষ্ট নিগূঢ়কে নাম দেওয়া যায় না, শুধু বলা যায় এই তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া—এই তার অভিব্যক্তির প্রয়াস. কিন্তু মানুষের আন্তর জীবনে ক্ষণে ক্ষণে যে বিপ্লব ঘটছে, দিনে দিনে যে রূপান্তর হচ্ছে, মনে মনে নূতনের যে আভাস আসছে, তার সম্পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ প্রায় অসম্ভব— তা তিনি কবি, কথাশিল্পী, চিত্রকর বা বাণীবিলাসীই হোন্। শ্রী অরবিন্দ নিজেই বলতেন—Life actual at its best is a broken rhythm—প্রকৃত জীবন ভাঙা সুরে ভরা—সেই সেতারখানি নূতন করে বাঁধতে হয়—জীবন মানেই সৃষ্টি—সৃষ্টি মানেই নিজেকে ফিরে পাওয়া। কল্পনাশ্রয়ী মানবমন শুধু বাইরের জগৎকে মনের লীলার সঙ্গে গ্রথিতই করছে না, তাকে পদে পদে রূপায়িত করে, বৈচিত্র্যময় করে তাকে সঞ্জীবিত উদ্দীপিত করে অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে না— সে এক অসন্তুষ্টির সুরও বহন করে নিয়ে চলেছে, একটা অতৃপ্তির ধারা—এ অতৃপ্তি শুধু ভোগের উপাদানের অভাবের জন্য নয়, বৃহত্তর উন্নততর জীবনের জন্য কান্না – যে জীবন জন্ম নিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে, তারই প্রসববেদনা। "Future poetry" বা ভবিষ্যতের কাব্য কি রূপ নেবে সেই প্রসঙ্গে এই কথাই তিনি বলেছিলেন।

১৫ই আগষ্ট, এই দিনটি জাতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় যোজনা করেছে। এই দিনটি মহাসাধক শ্রী অরবিন্দের পুণ্য আবির্ভাবেরও দিন। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন বলেছিলেন, আজ যে নূতন রাষ্ট্র গঠিত হল তার আছে অপূর্ব সম্ভাবনা (untold potentialities), ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। যুগ যুগান্তর ধরে এই বিরাট বিশাল দেশের পথে প্রান্তরে, গিরিকন্দরে, কন্যাকুমারিকা থেকে বদরিকায়, পরশুরামক্ষেত্র থেকে দ্বারকায় তার উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে, তার তরঙ্গমুখর সমুদ্রতটে আমরা পেয়েছি জ্ঞানী-গুণীর দল, ভক্তদের কর্মীদের। অতীতের কথা ছেড়ে দিলেও এই সেদিনও আমরা পেয়েছি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমকে, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে, বিবেকানন্দকে, গান্ধীজির মত যুগন্ধর কর্মীকে, রবীন্দ্রনাথের মত অলোকসামান্য কবিকে, শ্রীঅরবিন্দের মত যোগক্ষেম-অনপেক্ষ শুচিদক্ষকে। বাংলার মননের ইতিহাসে তাঁরা এসেছিলেন এক ঋতু পরিবর্তনের যুগে। পশ্চিমের

দুর্বার স্রোত বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্রবোধের চেতনা নিয়েই ধাক্কা দেয়নি, শুধু রেল টেলিগ্রাফ ডাকঘরের পশরাই আনেনি, এনেছে জীবন যাত্রার অভ্যস্ত উপকরণের বাইরের বহু জিনিষ। ইংরেজ যখন আসছে ইউরোপের চিত্তদূত রূপে (রবীন্দ্রনাথের কালান্তর), তার জঙ্গম শক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করছে। একশো বছর আগে দেখছি, শিক্ষার নূতন রীতিনীতি গৃহীত হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পর্ব সামাজিক জীবনে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়েছে, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে তীব্র। রামমোহনের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা, দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ও কেশব সেনের বাগ্মিতায় যার প্রতিপত্তি, সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবন শতদলে টলমল করছে। ওদিকে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর কোলে দেবী ভবতারিণী নামছেন আকাশ বেয়ে—মেঘাঙ্গী বিদ্যুৎ বাহিনী এলো-কেশী—গদাধর চট্টো বলে এক আধ পাগলা পূজারী ব্রাহ্মণ—'মা' 'মা'-বলে ডাকছে,—আয় তোরা আয়, কোথায় আছিস্ আয় আয় বলে কেঁদে চোখের জলে ভাসছে। তখনও তিনি দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণ পাণি প্রসারিত করে প্রসন্ন তপস্বী নন্, তখনও তাঁর বীর শিষ্যেরা প্রায় অনাগত। ভারত-পথিক বাংলাদেশে তখন এক নতুন জোয়ার—a society electric with thought and loaded to brim with passion এমন একটা সমাজ, যা নূতন নূতন চিন্তার ধারায় বিদ্যুতের মত চঞ্চল এবং আবেগের দ্বারা পরিপূর্ণ। হয়তো তখনো সেই বেগ সমাজের নিম্নস্তরে পৌছয়নি, কিন্তু তারই প্রস্তুতিতে এগিয়ে দিয়েছে। সমাজবিবর্তনের এই ধারা লক্ষণীয়।

আঁকি দিল দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুৎ বহ্নিতে মহামন্ত্রলিখা। সেই মন্ত্রই ধ্যানলব্ধ "বন্দে মাতরম্" যার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "The Mother had revealed herself" মা প্রকাশিত করেছেন নিজেকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা যে মাতা বাহুতে যার শক্তি, হৃদয়ে—যার ভক্তি। তখন শ্রীঅরবিন্দের কম্বুকণ্ঠে শুনি—Let Bengal be true to her own soul. বাংলাদেশ নিজের সত্তার প্রতি সত্যধর্মী হোক্।

ঐতিহাসিক টয়েনবীকে স্মরণ করে বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমের ধাক্কাখাওয়া সমাজমন নূতন করে জেগে উঠেছে তখন, 'আলালের ঘরের দুলাল,' 'হুতোম পেঁচার নক্সা,' 'সোমপ্রকাশ' 'প্রভাকর'কে পেছনে রেখে—

এ যুগ শুধু বিস্তারের যুগ, বিশ্লেষণের যুগ বা বিপ্লবের যুগ নয়, একে রেনাসাঁস বা নাসাঁস যাই বলি না কেন, এ যুগ সমীকরণের যুগ, আত্ম-চিন্তার যুগও। এই যুগকেই উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে টেনে নিয়ে এসেছিলেন যে ত্রয়ী তাঁরা হচ্ছেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ। বিবেকানন্দ অবশ্য নরদেহে বেশি দিন ছিলেন না, কিন্তু ভাবজগতে তাঁর এবং বঙ্কিমের চিন্তাধারা বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদের বাংলাদেশে যে রসায়ন এনেছিল তার তুলনা অন্য কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় কিনা জানি না।

অনেককেই বলতে শুনেছি যে, শ্রীঅরবিন্দের লেখা দুর্বোধ্য তিনি বড্ড বেশি চিন্তা করেন, কবি হিসাবে স্মরণীয় বরণীয় হলেও তাঁর গভীরতত্ত্ব কাব্যসুষমাকে দূরে রাখে, তাঁর সাধন-ভজন মানুষ বোঝে না। এমন কি, এ অপবাদও শোনা যায় যে, তিনি দেশের দুর্দিনে পালিয়ে গিয়ে যোগের ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন। অবশ্য দুটি গুণ সবাই স্বীকার করে নেন যে, এককালে তিনি ছিলেন উগ্র-রকমের স্বাদেশিক, আর অত্যন্ত উঁচুধরনের পণ্ডিত, দার্শনিক জ্ঞানী। কেউ কেউ বলেন, দেশের জন্য যেমন তাঁর অদ্ভুত মমত্ববোধ ছিল তেমনি ছিল অনাসক্তি। এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার কাজ নয়, তবু আমরা একটা ভুল করি যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগ, জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, এ যোগ হচ্ছে বিশ্বছন্দের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেই আত্মউন্মীলন, সমস্ত সত্তার একত্রীকরণ (Integration)। তাই All life is yoga (সমস্ত জীবনই যোগ)। যোগ শুধু পাওয়া নয়, হওয়া—তাকে পাব না, তার মধ্যে দলে দলে ফুটে উঠে 'হব', দলবিকশিত হয়ে, মাধুর্যে, সৌন্দর্যে, শক্তিতে প্রেমে, প্রেরণায় ত্যাগে। তাই ভারতবর্ষ তাঁর কাছে শুধু একটা ভৌগোলিক সীমা ছিলনা, ভূখণ্ড নয়, শক্তি, মা—তাঁর কাছে রাজনীতি জাতীয়তা নয়—রাজনৈতিক আন্দোলন (উত্তর পাড়া বক্তৃতা) একটা বিশ্বাস, একটা নিষ্ঠা, একটা ধর্ম। তিনি বলেছিলেন—আমি মুক্তি চাই না, আমি চাই জাতিকে তোলবার শক্তি—আমি যে ভালবাসি ভারতের লোক সকলকে। তাই পণ্ডিচেরী থেকে তিনি বারীনকে ও চিত্তরঞ্জনকে লিখেছিলেন—আমার তপস্যা হচ্ছে আমূল পরিবর্তনের, কারণ—আমি গড়তে চাই নূতনতর ভিত্তিতে—অসংস্কৃত চিত্ত ও অপূর্ণ মানুষ নিয়ে কী নব সৃষ্টি করবো।

দেশবন্ধু তাঁর সওয়াল জবাবে যে কথা বলেছিলেন সেই কথাই মনে হচ্ছে—বহুদিন পরে এই বিবাদ বিসংবাদ যখন বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাবে, যখন এই আন্দোলন স্তিমিতস্তব্ধ হবে, যখন তিনি এই মরধাম ছেড়ে অমৃত লোকে প্রয়াণ করবেন, তখনও তাঁকে দেখিয়ে লোকে বলবে—এই সেই মানুষ, যে স্বদেশ প্রীতির মূর্ত প্রতীক ছিল, জাতীয়তার পুরোহিত ছিল, মানবতার পূজারী ছিল—তার বাক্যাবলী বারে বারে প্রতিধ্বনিত হবে, দিকে দিকে রণিত হবে।

যোগী শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলবার অধিকার আমাদের নেই, শুধু গীতার কথা স্মরণ করবো, যে যোগী হচ্ছেন তপস্বীর অধিক, জ্ঞানীর অধিক, কর্মীর অধিক।

কবি শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যায়, বিশেষ করে "সাবিত্রী"র সম্বন্ধে. যে মহাকাব্যের নায়ক স্বয়ং মানবাত্মা বা অশ্বপতি—যেখানে এক অনাদি আনন্দের হিল্লোলে দুই উঠেছেন জেগে—God lives hidden in the clay—এ হচ্ছে ঘরের চৌকাঠ্ দরজা বন্ধ করে মিলন নয়, সমস্ত চেতনা নিরুদ্ধ নিবদ্ধ করে মুক্ত প্রাঙ্গণে আলোর অভিসার যাত্রা। সেই চিত্র সমুচ্চয়ের গানই সাবিত্রী-সত্যবানের গান। একদিকে মাটির পৃথিবী আর একদিকে অনন্ত যৌবন আকাশ. দুই নিয়েই দ্যাবাপৃথিবী আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক অর্ধনারীশ্বর। স্বর্গ ফিরে চায় ধরণীর দিকে—যে ধরণী ক্লান্ত নয়, তপ্ত নয়, পূর্ণের অভিসিঞ্চনে মধুময়—আর পৃথিবী চেয়ে থাকে স্বর্গের দিকে—জরা মৃত্যু বিনষ্টির অতীত যে লোক। প্রেমের পট্টবাস পরে তপস্বী মানব চলবে স্বর্গের দিকে দীপশিখা হাতে—আর সেই আলোর পথ রেখায় স্বর্গের দেবতা নামবেন মাটির ধূলোয়—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা দুইএর হবে যাত্রা একত্তর। কোন পাহাড়ের কোন সাগরের ধারে কোন মানুষের বুকে দুইএর হবে মিলন, তারই প্রতীক্ষায় মানব-মানবী দাড়িয়ে। শ্রীঅরবিন্দের জীবন বোধ জীবনবাদ ছাড়িয়ে এই জীবনবেদে পৌঁচেছে "সাবিত্রীতে"—একটি স্বীতবী পরিপূর্ণ প্রত্যয়ে—কবিতা যেখানে মন্ত্র। সাবিত্রী শুধু অনুভূতির কাব্য নয়, প্রতীতিরও, অখণ্ড উপলব্ধিরও। সেটা দার্শনিক তত্ত্ববিচার নয়, কাব্যিক মোহজাল নয়, মল্লিনাথীয় টীকা নয়, এ হচ্ছে সত্যদর্শন—

"তুমি আছ, আমি আছি, সত্য আছে স্থির"

In the ending of time, in the sinking of space
What shall survive ?
Hearts once alive,
Beauty and charm of a face ?
Nay, these shall be safe in the breast of the One,
Man deified
World-spirits wide.
Nothing ends, all but began

কালসীমা শেষ হবে যাবে যবে
আকাশবাতাস সব নিমজ্জিত হবে
বিলুপ্তির অতলগর্ভেতে হয়ে যাবে ফাঁকি
তখন কিছু কি আর রবে না বাকি
সব কিছুর হবে অবশেষ
নাহি রবে একটুকু রেশ ?
যে হৃদয় ছিল একদিন প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল
যে মুখের রূপশ্রীতে ধরণী করিত ঝলমল ?
না, না, তারা আছে, আছে, পেয়েছে আশ্রয় নিরাপদস্থানে
এককের অনিঃশেষ কক্ষে, অশঙ্কিনীর আহ্বানে
মানব উন্নীত যেথায় দেবত্বের উদাত্ত বীণায়
পৃথ্বী সত্তা ঝঙ্কারিত, প্রসারিত চেতনায়
শেষ নাই, শেষ নাই, নাই কোন অবসান
সারা নয়, সুরু শুধু, কেবলই আরম্ভের গান

"সাবিত্রী" শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র জীবনের বিবর্তনের একটানা ইতিহাস, তাঁর আন্তর জীবনের অভিব্যক্তি, তাঁর কাব্য জিজ্ঞাসার রূপ, তার জীবন-প্রেরণার ছন্দ। তাই এই মহাকাব্যের মূল সুরটিকে ধরতে গেলে সামগ্রিক অরবিন্দ চেতনার ও চিন্তার কিছু পরিচয় প্রয়োজন।

কবি, কর্মবীর, দার্শনিক, স্বদেশপ্রেমিক, চিন্তানায়ক, রসবেত্তা, প্রগাঢ় মনীষার অধীশ্বর, মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ একাধারে চতুর্মুখ বা পঞ্চানন। তাঁর কাব্যে রূপ-রং-রস রেখাকে ছাড়িয়ে যে উর্ধ্বতর আস্পৃহা

প্রকাশ পেয়েছে—ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, রূপকে প্রতীকে—তার গভীরতা বুঝতে গেলে যে শ্রদ্ধাবান্ চিত্ত, সমর্পিত এষণা বা গ্রহিষ্ণু মনের দরকার তা আমাদের নেই। আর কবি শ্রীঅরবিন্দকে যোগী শ্রীঅরবিন্দ থেকে পৃথক্ করে দেখা গেলেও সে বিচার সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু নয়, আর যোগ সাধনা সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

আর এক মহাযোগী ও মহাকবির কথাই মনে পড়ে; যিনি বলেছেন—

বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো জগদিদং প্রাপ্তবিবিকল্পং পুর্ণ
মায়াকল্পিত দেশকাল কলনা বৈচিত্রচিত্রীকৃতম্
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া,

যে জগৎসৃষ্টির পূর্বে বীজের মধ্যে অঙ্কুরের ন্যায় অব্যাকৃত থাকে অথচ নাম ও রূপের কল্পনায় দেশও কালের অপূর্ব প্রভাব দ্বারা বিচিত্রিত হয় সেই জগৎকে যিনি মায়াবীর ন্যায় মহাযোগীর ন্যায় স্বেচ্ছায় চিত্রিত করেন তিনিই দক্ষিণামূর্তি গুরু। তিনিই কবি। আমাদের শাস্ত্রে কবি তাই মনীষী, স্রষ্টা, শুধু দ্রষ্টা, চিত্রকর বা রূপকার ন'ন।

সাধারণ পাঠক পাঠিকার পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ-কাব্য বোঝবার কয়েকটি বিশেষ বাধা আছে—

প্রথমতঃ শ্রীঅরবিন্দের কাব্য ও কবিতাগুলি বেশীর ভাগই ইংরাজীতে লেখা (কিছু ফরাসী প্রভৃতি অন্য ভাষাতেও আছে) এবং সে ইংরাজী, সে রচনাভঙ্গী শুধু Classical নয়, বহুল প্রকারে ইউরোপীয় সাহিত্য বিশেষ করে গ্রীকোলাতিন সাহিত্যের পরিবেশ, পরিভাষা ও পরিচয়ের দ্বারা প্রভাবিত। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই একদিন বলেছিলেন—'To be original is an acquired tongue is hardly feasible, প্রশ্ন উঠতে পারে বিশ্বসাহিত্যে এর স্থান কোথায়। অবশ্য কবির বিচার কাব্যের রূপ ও নৈপুন্য নিয়ে, তাঁর অনুভূতির প্রকাশমহিমা নিয়ে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের বেশ কিছু ভাগ গীতিকবিতা ও খণ্ডকবিতা হলেও তারা মহাকাব্যের ঘনীভূত রূপের আভাস দেয়। তার ভাবে, ভাষায়, ঝংকারে, বর্ণ বৈচিত্র্যে, উপমায়, তত্ত্বে ও তথ্যে, একটা গভীরতম রহস্যের অনুভূতি আসে।

তৃতীয়তঃ তাঁর কাব্যের যতটুকু প্রকাশ বাইরে, তার চেয়েও গভীরতা ভিতরে—It has not been on the surface for men to see. সেইজন্য তাঁর কাব্যের বিচার সাধারণ গণ্ডি দিয়ে সমীচীন নয়—

চতুর্থতঃ যদিও শ্রীঅরবিন্দ-কাব্যকে তাঁর জীবনের বা বিষয়-বস্তুর ভাগ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা যায়, যেমন বরোদাবাসের যুগ, কলিকাতায় কর্মযোগীর যুগ, পণ্ডিচারীর যুগ বা প্রস্তুতির যুগ, প্রকাশের যুগ ও আত্ম সমাহিতির যুগ বা মানুষ ও স্বাদেশিক অরবিন্দ, আসলে সব ছাপিয়ে তাঁর কাব্য জুড়ে বসে রয়েছে প্রচ্ছন্ন যোগী-রূপ। তাই তাঁর কবিজীবনের আবির্ভাব মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের মতো—Like Minerva born in a panoply। কবি হচ্ছেন তিনি, যিনি দেখেন অর্থাৎ Seer, তাঁর কাব্যে ছায়া পড়ে এই বাইরের আর ভিতরের জগতের। সাধারণতঃ কবির দৃষ্টি জৈব স্তরেই (vital plane) আবদ্ধ থাকে, যা তিনি পেয়েছেন অবচেতনায় উত্তরাধিকার সূত্রে, রক্তের কৌলীন্যে, সংস্কারের বীজে, সুপ্ত কামনার এষণায়, তার সঙ্গে সঙ্গে আছে বাহ্য চেতনা—যা আমরা দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, তার পরেও আছে বুদ্ধি চেতনা অর্থাৎ যা আমরা আমাদের বুদ্ধিবিদ্যার বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করছি। এইখানেই সাধারণতঃ প্রকাশের সীমা শেষ। তার-পরের যে চেতনা, তার যে নামই দিই না কেন, তারই উপলব্ধি হল বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে যুক্ত বোধিচেতনায়। তাকেই বলা যেতে পারে উর্ধ্বতর মানস, ভাস্বর মানস, (Higher mind, Illumined mind) যার শেষ অভিব্যক্তি অতি মানস (Supermind)। সেই মানস-তরঙ্গ তলেই বাণীর সংগীত শতদল নেচে ওঠে জেগে। সেই সর্বভূতান্তরাত্মা বা অভিরূপভূয়িষ্ঠ সার্বভৌমিক চেতনাই অধিকারী ভেদে কবি-মনে কাজ করে চলেছে। মূলে সুর ও বীজ এক, প্রভেদ শুধু বিস্তারে, পারম্পর্যে, মূল্যবোধে, সূক্ষ্ম ও গভীরতর প্রকাশে, নব নব বঞ্জনার রূপায়ণে ; যা ছিল আত্মকেন্দ্রিক (ego centric) তাই মূল্যবোধের রূপায়ণে বদলে হয় value centric, এমন কি মূল্যবোধের সীমাও সর্বাস্তিবাদে মিলিয়ে যায়। সেইজন্য বিভিন্ন মানসিক স্তরের উপলব্ধি থেকে লেখা কাব্যের ও প্রকাশ বিভিন্ন, তার রূপ, তার ব্যাপ্তি, তার বিস্তার, তার ঐশ্বর্য, তার বর্ণসম্ভার বিভিন্ন। তাই কাব্য শুধু ছবি নয়, প্রকাশ নয়, মনো বিকলন নয়, পরিচিতি পত্র নয়—অসমাপ্ত মন্ত্র, ঋতের ছন্দ,

Legend, Symbol। শ্রীঅরবিন্দ কাব্য বিচারে এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা উচিত এবং 'সাবিত্রী' পড়লে এই সত্যটি আপনি হৃদয়ঙ্গম হয়। ধরুন, পাঁচজন কবি একটি ফুলকে দেখলেন, কেউ প্রাধান্য দিলেন তার তরঙ্গায়িত বর্ণসুষমাকে, কেউ দেখলেন তার utilitarian রূপ, কেউ তার মধ্যে thoughts do often lie too deep for tears, আবার এক স্তরের কবি দেখলেন অসীমের ভাবব্যঞ্জনা, বিশ্বাতীত ছন্দ। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন "If I had to write for the general reader I could not have written 'Savitri' at all. It is in fact for myself that, I have written it and for those who can lend themselves to subject matter, images and technique of mystic poetry."

পঞ্চমত: সেই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন আসে কাব্যের সংজ্ঞা কী, তার বিচার-বস্তু কি, তার উপজীব্য বিষয় কি, তার অলংকার, তার বিভূষণ, তার আলম্বন কী রকম হবে, ভাব ও ভাষার কতটা রসায়ন হলে তাকে সার্থক কাব্য বলবো। কাব্য কি শুধু রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি, না তা Simple, Sensuous, Passionate হওয়া চাই। প্রাচীন কালের কবি দার্শনিক ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে বললেন—রসাস্বাদন করিবার ও করাইবার ও পরামার্থ বস্তু প্রকাশন সমর্থ যে রীতি এই মিলিয়েই কবিদের নব দৃষ্টি। এ সংজ্ঞা আজকের সমালোচক ও রসজ্ঞরা মানবেন কিনা জানিনা। কিন্তু কাব্যের রূপ নির্দেশ করতে গিয়ে Edwin Markham নামে একজন American কবি যা বলেছেন, সে কথা প্রণিধানযোগ্য—"Something more than vital is released, Something organically rhythmical that has no need of embellishment or conventional device to make its poetical nature explicit."

জল পড়লো, পাতা নড়লো, শিশু চোখ মেললো মায়ের কোলে, আলোর রাজ্যে ; সে বড় হল, অন্নের জন্য তার বুভুক্ষা এলো, জীবিকার জন্য তাগিদ, দ্বন্দ্বময় জগতে তাকে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করতে হ'ল, তার রক্তে আসে জোয়ার, সে চায় ভোগ করতে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, প্রতিটি অণুতে অণুতে স্পর্শে স্পর্শে সে পরি মূঢ়েন্দ্রিয় হবে, প্রিয় চাইবে

প্রিয়াকে, প্রিয়া চাইবে প্রিয়কে, বীরভোগ্যা হবে বসুন্ধরা—এ সব ত প্রতিদিনই ঘটছে এই জাগতিক রক্তমাংসের পৃথিবীতে। রূপ-রেখারং-এর সীমার জগতে, এই ঘটনাপঞ্জী নিত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিধ্বনি উঠছে মনের জগতে (Psychological plane, এ) এমন কি Psychic এ ও। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে যে কোন সৃষ্টির কাজে এর ছায়া পড়ছে, আমরা পাচ্ছি তার রূপ, বর্ণনা, দ্বন্দ্ব, বিচার, রসোদ্বেলতা। আধুনিক সমালোচক বলবেন—এর পর আর এগিয়ো না—জীবন দর্শন করো ক্ষতি নেই কিন্তু জীবনের সঙ্গে দর্শনকে জড়িয়ে তাকে দুর্বোধ্য করো না—এর মধ্যে অতীন্দ্রিয় আরোপ, বিশ্ব বাসনার কল্পনা বা বিশ্বনীতির ছন্দের সংযোগ, হার্মনি বা সৌষম্য এসব এনো না। তাই অনেকের কাছে মিষ্টিক্ অর্থাৎ—অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক আবেদনে স্বীকার ত নেইই, মূল্যও তাঁরা দেন না, কারণ রক্তমাংস কাম-কামনার বাইরে যে শ্যামকান্তিময়ী স্বপন মায়ার জগৎ, অজানাকে জানার যে বুভুক্ষা তার অস্তিত্ব আছে কিনা, এইটেই তাঁদের কাছে মহতী বিনষ্টির প্রশ্ন। মানুষ যে দ্বৈতের দোলায় দুলছে, তার এক কোটিতে সীমা, আর এক কোটিতে অসীম—এই দুই নিয়েই তার দ্বন্দ্ব, তার ভাব ভাবনা, একথা যাঁরা স্বীকার করে নেন তাঁরাই বলেন, কবি তিনিই যিনি এই মৃন্ময় মনের চিন্ময় অভিসারকে ছন্দে, কাব্যে, রূপে, রসে, ভাষায় ও ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায় ছায়া আর আলো, মন্দ আর ভালো নিয়ে নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে, সেই বিশ্ব প্রবাহে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলা নদীর আবর্তনে যে ছবি ফুটছে, কবি তাঁকেই বাঁশীতে ধরছেন, তুলিতে আঁকছেন, ভাষায় রূপান্তরিত করছেন। রবীন্দ্রকাব্যে বারে বারে এই সার্থক ছবি পেয়েছি, ভূমার মধ্যে যে সীমা আছে, যে অপরূপ প্রাণবীজের ক্রিয়া হচ্ছে তারই বিচিত্র গাথা, গীতি ও গান। তাই কবির হৃদয়ে—মনের বীণা যন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়—এ হচ্ছে প্রাণবান, এর সুর এগিয়ে চলেছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, সে কোথাও স্থির হয়ে নেই, কোথাও গিয়ে সে থামবে না, সে এগিয়ে যাবে। কবি সেই বিচিত্র রূপিণীর প্রেরণায় অনুপম উপমা ও কল্পনার সাহায্যে বুদ্ধিকে উন্নীত মার্জিত ও শাণিত করেছেন, অন্তরকে রসায়িত ও রূপায়িত করেছেন, ঐশ্বর্যময় ভাবময় কল্পলোকের সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর কাব্য অবচেতনা ও

বাহ্যচেতনা পেরিয়ে বুদ্ধি ও বোধিচেতনার সঙ্গমতীর্থে পৌঁছেচে এবং শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—'সেই প্রত্যন্তদেশ অতিক্রমণেরই অফুরন্ত সংগীত মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে অন্তরাত্মার সত্য রূপের জ্যোতি ও ধ্বনি মানবজীবনের সূক্ষ্মতর প্রকাশের মধ্যে নব নব নিগূঢ় অর্থ এনে পৌঁছে দিয়েছে।' তাঁর বাণী তাই শুধু শ্রীময়ী নয়, হ্রীময়ীও। যদিও তিনি বললেন, আমি মাটির কবি, আছি ধরণীর অতি কাছাকাছি এবং সেই শুভে অশুভে স্থাপিত পাদপীঠে তাঁর ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি রেখে গেলেন নাম গ্রাসী, আকার গ্রাসী, সব পরিচয় গ্রাসী, নিঃশব্দ ধূলি রাশির মধ্যে। মহৎ মৌনের গিরিশৃঙ্গমালায় বসে শ্রীঅরবিন্দ আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, তিনি বললেন—Poetry is a rhythmic speech which rises at once from the heart of the seer and the distant house of truth......The greatest poets are those who had a large and powerful interpretative and intuitive vision and whose poetry arises out of the revealatory utterance of it.

তাই কাব্যলক্ষ্মী তাঁর কাছে ধরা দিলে উত্তরসাধিকা রূপে, সম্বোধি রূপে। কস্মৈ দেবায়—এ প্রশ্ন চিরন্তন—উপনিষদের ঋষি থেকে আজকের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই প্রশ্নই করেছেন—পশ্চিম সাগরতীরে নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যায়—কে তুমি—মেলেনি উত্তর। শ্রীঅরবিন্দও এই প্রশ্ন করছেন—who—কে তুমি—কিন্তু প্রাচীন দিনের দ্রষ্টার মতো সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধিও করছেন—

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবা যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
আপনারে দেন যিনি, সদা যিনি দিতেছেন বল
বিশ্ব যারে পূজা করে, পূজে যারে দেবতা সকল
অমৃত যাহার ছায়া, যার ছায়া মহান মরণ
সেই দেবতাকেই—

We have seen Him a muse on the snow
of the Mountains
We have watched Him at work in the
heart of the Spheres

In the pattern and bloom of the flowers
He is woven
In the luminous net of the stars He is
caught
In the strength of a man, in the beauty
of a woman
In the laugh of a boy, in the blush of a girl
In the sweep of the world's in the surge
of the ages
Ineffable, mighty, majestic and pure
Beyond the last pinnacle seized
by the thinker
He is throned in His seat that for ever
endure
আমরা দেখতে পাইনা, আমরা দৃষ্টিহীন
He is close to our hearts, had we
vision to see.

তাইতো প্রার্থনা ওঠে—হে আত্মা মহীয়ান্—শতশত শতাব্দীর জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জিত ভার দূর করে দাও, (Remove my sullied centuries) আমার পবিত্রতাকে ফিরিয়ে দাও, (Restore my purity)—খোলো খোলো দ্বার, দাও জ্ঞানের গূঢ়তম রহস্যের চাবি, (O, hidden door of knowledge open) শক্তি দাও, শক্তি দাও, সার্থক হোক আমার বীর্য, ওজঃ (strength fulfil thyself)। সব পথ এসে মিশে যাক্ শেষে প্রেমের ঝর ঝর ধারায়, যেন সেখানে কোন কার্পণ্য না থাকে, কোন দৈন্য (Love outpour)। কবিতা, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ও প্রকাশ। সমালোচক তার সঙ্গে জুড়ে দেবেন স্টাইলের চমৎকারিত্ব, রচনার শৈলী, ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ, ছন্দের বন্ধন, "রীতিষু" রেখাস্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতং,।"

ভামহ, দণ্ডী, আলঙ্কারিকরা বলবেন, শ্লেষ, ওজঃ প্রভৃতি গুণের কথা। কিন্তু আজকের কবি যখন লিখবেন—

'হাজরা পার্কে সভা কাল, নিরপেক্ষ থেকে আর
চিত্তে নাহি সুখ'
বা মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হতো হাবে ভাবে'
কিম্বা গলিত নখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস'

'আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে হে ক্লান্ত উর্বশী'
'অগ্নি বর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায় এক দ্বিতীয় বসন্ত'
'উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন কাটুক যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুর প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ তুলুক্ কারখানায়'

বা নগ্ন নির্জন হাত, যখন বনলতা সেনকে ডাকে বা আকাশলীনা সুরঙ্গনাকে, 'মিশরের মমী' মৈনাক সৈনিককে, তখন আমাদের কোথাও হারিয়ে যাবার নেই মানা এ কথা ঠিক, কিন্তু আমাদের যেন বিলাপ করতে না হয় যে, সেগুলো শুধু কথার আঙ্গিকেই পর্যবসিত থাকবে, তাহলে—
'কথাগুলি যদি ভুলে যাই, তবে কী হবে, তবে কী হবে'—আর কি হবে কোমল কাটির স্বপ্ন দিয়ে সন্ধ্যা যেখানে বন্ধ্যা ও একাকিনী' রাত্রিব দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবই কি আমাদের তন্দ্রা ভাঙবে? কবি মানসে এর সার্থকতা নেই একথা বলবো না। যখন কবি বলেন 'আমি কবি কামারের ছুতোরের মুটে মজুরের বা 'মানুষের মানে চাই, গোটা মানুষের মানে' তখন তার 'ক্রন্দসী' আত্মাকে বুঝতে পারি তার রূপায়ণকে অভিনন্দন করতে পারি। এ'ও রূপের কাছে, রসের কাছে, প্রাণের কাছে প্রণাম—তার হিল্লোলকে, কল-কল্লোলকে স্বীকার করা, কিন্তু মানুষের অভীপ্সা শুধু ঐ টুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবে কেন, 'আমার ঠিকানা' খুঁজতে হবে সূর্যোদয়ের পথে। সাধারণ সাহিত্যে আমরা খুঁজি আমাদের পরিচিত জীবনের ছবি, তার ব্যথা, তার পল্লবিত মনস্তত্ত্ব, উদ্বেগ, উল্লাস, বেদনা—কিন্তু যাঁদের জীবনে মহাজীবনের শরণ নেমেছে, তাঁদের Realism ত শুধু সেইটুকুতেই তৃপ্ত নয়। অধ্যাত্ম জীবনের বা মানস চেতনার কথা আমার কাছে হয়তো মিথ্যা, কিন্তু যাঁর অনুভূতি হয়েছে, তাঁর কাছে সেইটাই অতিমাত্রায় অতি বাস্তব। তাঁর কাব্যের ছটা যদি সেই রঙ্গভূমি

পার হয়ে অন্য জগতের সন্ধান দেয় সেইটাই তাঁর কাছে রিয়েলিজম, তাই সাধারণ কাব্যও অসাধারণ হয়ে ওঠে, যেমন শ্রীঅরবিন্দের নিম্ন-লিখিত কবিতায়।

নূতনদিনে পেয়েছি জানি
অনেক কিছু দান
জীবনে মোর জোয়ার লেগেছে
লগ্ন ভোলার তান•
পুরোণো পৃথিবীর তিনটি সাখী
যাদের লয়ে ছিলাম মাতি
মনের কূজনে প্রাণের গুজনে
রতি আরতিতে প্রচুর
সুন্দরী, সুরা আর সুর
প্রেম মদিরা আর গান
দিয়েছিলো যারা
জীবনেরে মোর রসোত্তম মান
ছন্দে গন্ধে মধুরতায়
সুরভিত বিহ্বলতায়
এই প্রথমেরা লভিত যদি
শ্রেষ্ঠের সম্মান
উর্ধ্বতমের আস্পৃহাতে
পূর্ণের অবদান

(Many boons the new years make us
But the old world's gifts were three
Dove of cypris, wine of Bacchus
Pan's sweet pipe in Sicily.
Love, wine, song, the core of living
Sweetest, oldest, musicalest
If at end of forward striving
These life's first also proved best.)

সেই সুন্দরী, সুরা আর সুর, প্রেম, মদিরা আর গান, জীবনের অগ্রগতিতে এই প্রথমগুলিই যদি শ্রেষ্ঠ হোত। অনেকে বলেন, শ্রীঅরবিন্দের কাব্য বিচারে, কবি অরবিন্দের চেয়ে যোগী অরবিন্দই চেপে বসেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসার মূল সূত্রটি কী। যৌবন কালে তিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে জীবনের আনন্দ, আতপ্ততা, বিলাস (Life's joy, warmth, sensuousness) আছে কিন্তু তিনি দেহবিলাসী নন, যদিও তিনি লিখছেন প্রেম নিবেদন করছেন তরুণী এস্তেলকে, বলছেন (Kiss me Edith), দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী পুষ্পিত যৌবনকে আরো ফুটন্ত করতে চাইছেন কিন্তু দেহের লীলার পিছনে আছে অপরা অনুভূতি যে আমার সত্তা সহস্রতারকায় আলোকিত। (My spirit is a heaven of thousand stars) আবার যারা বলেন যে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু যোগের বড় বড় কথাই বলেছেন, সংসারের জগতের বিরহ বেদনার অংশ গ্রহণ করেন নি, অভাব, অনশন অতৃপ্তির কথা বলেন নি. তাঁরা জানেন না যে. মানবজাতির কত ব্যথা তিনি নিজের বুকে বহন করতেন। তাই তিনি বারীনকে লিখলেন—অসম্পূর্ণ অপরিণত মানুষরা অপূর্ণ মানুষদের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করবে। (What can an imperfect man do in the midst of imperfect man)। তাইতো চিত্তরঞ্জনকে লিখলেন, আমূল পরিবর্তন দরকার। এই সেদিনেও তিনি লিখেছেন—

আমার অবারিত দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেছে এই বিশ্বে
কোথাও নেই বাধা
প্যারিস, টোকিও, নিউ-ইয়র্ক সবই এক সুরে সাধা
বম্ব পড়ছে বার্সিলোনায়, কান্টনের রাস্তায়, জনারণ্যে
সংখ্যাগণনার অতীত মানুষের যে কুকীর্তি
সবই ঘটছে আমার মাঝে
যা কিছু সামান্য সুকীর্তি, তাও
আমিই সেই পশু, যাকে সে মারে, প্রাণ নেয়
আমিই সেই প্রাণী যাকে সে বাঁচায়, প্রাণ দেয়
আমার এই নির্জন নিভৃত বুকে
সমস্ত মানুষের দুঃখকে বহন করে নিয়ে চলেছি

(I carry the sorrow of millions in my lonely breast).
(More Poems—Sri Aurobindo)

বিশ্বমানবের প্রতি এই যে দরদ, এই যে আত্মীয়তাবোধ—এই তো সমগ্রক্ষের জ্ঞান—বৈষ্ণব পরিভাষায় অনন্ত মমতা থেকেই সর্বত্র মমতা।

আমিই সমগ্র মানবজাতির দূত
মৃত্যু ও রাত্রিকে অতিক্রম করে এসেছি
আমি সুন্দরের প্রতিমা
অমরার অসীমতা আমাতে নিয়েছে সীমা
আমিই তো অমৃত আলোকের শিকারী
উদ্দীপ্ত সত্তার অগ্নি আমার সম্বল
সান্ত থেকে অনন্তের পথে আমি যাত্রী
আমি চাই সেই পরাশান্তি
যা কখনো পরাজয় স্বীকার করে না
আমি চাই এই পৃথিবীর জন্য দুঃখহীন কালহীন আনন্দের স্রোত
শোকে তাপে তপ্ত দুর্বলদের জন্য ভাগবতী বল
ভাগবতী আলো
অন্ধ অজ্ঞান অন্ধকারের মাঝে

(I am the messenger of the Human Race....)
(More Poems—Sri Aurobindo)

তাই মানুষকে এই ডাক—সে যদি নৈঃশব্দে ঢুকতে পারে, সে পাবে—অতীন্দ্রীম্ আনন্দম্, সীমাহীন রসাস্বাদ, সর্বশক্তিমান্ জ্ঞান, সর্বজ্ঞানময় শক্তি; যে আলোর পিছনে অন্ধকার নেই সেই আলো, যে সত্যকে কালের সীমায় নির্ধারিত করা যায় না, সে সত্য। **(Joy unimaginable, ecstasy illimitable, knowledge omnipotent, might omniscient, light without darkness, truth that is dateless)**। শ্রীঅরবিন্দ সাধনার প্রস্তুতি কৈশোর হতেই, জাত সাধক তিনি, তাঁর কাব্যে মহাজিজ্ঞাসার রূপ প্রথম থেকেই। তিনি এসে নামলেন এপোলো বন্দরে, ইংরাজী শিক্ষিত আধুনিক যুবক।

তাঁর মানস চক্ষে ভেসে উঠলো ভোগভূমি ভারতের ছবি নয়, এক ভূমাময়ী অচঞ্চলার। তিনি চলেছেন কাশ্মীরে, সামনে তাখ্‌তী সুলেমানের হিমমজ্জিত তুষার শুভ্র নীরবতা, তিনি দেখলেন—A face on the cold dire mountain peaks, grand and still, সেই রজতগিরিনিভং রম্য কল্লোজ্জলাঙ্গের মূর্তি—Life sprang from that blaring seed a flame trance. তার মাতিলার গান, উর্বশী, প্রেম ও মৃত্যু, বিদুলা, বাজীপ্রভু, নির্বাণ, শিব প্রভৃতি কবিতায় এই জিজ্ঞাসার প্রচুর সন্ধান মেলে। পরিত্রাতা পারসিউস এ the stage is the human mind of all times এবং এইখানেও শ্রীঅরবিন্দ-কাব্যের সেই সূচনা মানবাত্মার 'First promptings of the deeper and higher psychic and spiritual being which it is his ultimate destiny to become.' বন্দেমাতরমের অনুবাদে তিনি সাহিত্য সাধক ঋষির মন্ত্রকে আরো উজ্জীবিত করে তুললেন—(every image made divine). যা কিছু আমাদের মন্দিরে আছে সবই তুমি, সবই তুমি। শুধু বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি নয়।

সবই যে মায়ের মন্দির—ভবানী মন্দির। এই মাতৃকল্পনাই অমোঘরূপে বেজে উঠলো সাধক কবিদের চিত্তে নানা ছন্দে নানা বর্ণে বজ্রভেরী নিয়ে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে। দেশজননীই হলেন—বিশ্বজননী। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন তাঁর রুদ্ররূপ কালীর নৃত্যে, শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন —Dark as a thundering cloud, with streaming hair... obscuring heaven and in her sovereign grasp......the sword, the flower—রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ভেসে উঠলো—

> ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।
> তোর দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট-নেত্র অগ্নিবরণ॥

চিত্তরঞ্জনের 'সাগর সংগীত' শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদে নতুন প্রাণ পেলে—দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' তাঁর কণ্ঠে কল মন্দ্র মুখর হয়ে উঠলো 'ভারত আমার' 'ভারত আমার'—ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায় তাঁর নামকরণ করেছিলেন "মানস সরোবরের অরবিন্দ"—এমন "একটা গোটা খাঁটি মানুষ, এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, আবার কমলপর্ণের ন্যায় কান্ত পেলব, এ হেন গুণাঢ্য এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না।"

তাই চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—এই সেই মানুষ যাঁর কথা লোকে বলবে যুগ যুগ পরেও—Long after this controversy is hushed, long after he is dead and gone......His words will be echoed and reechoed. এই সেই মানুষ যাঁকে নমস্কার জানালেন কবিগুরু, সেই লোভহীন অবন্ধনকে, যিনি তপস্যার আসনে অপ্রগল্ভ স্তব্ধতায় ছিলেন আসীন। এই আত্মভোলা মানুষটি নিজের জন্য কিছু চাননি এবং তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, আমার তিনটে পাগলামী আছে, সব কিছুই ভগবানের—তাঁকেই সব দিতে হবে, তাঁকে পাওয়া যায় নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে, সেই পথ আছে; আর দেশটা একটা জড় পদার্থ নয়, কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পাহাড় নদী নয়....এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করতে গেলে তরবারি, বন্দুক, ক্ষাত্রতেজই একমাত্র তেজ নয়, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

I have been digging deep and long
Mid a horror of filth and mire
A bed for the golden river song
A home for the deathless fire.

ধূলিমলিন ধরণীর কর্দম পঙ্কের গভীরে নেমে তিনি প্রাণোজ্জ্বল মৃত্যুহীন পাবন শিখাকে জ্বালিয়ে দেবেন।

'ঋষি' কবিতায় পড়ি, মানবজাতির পিতা ও ত্রাতা মনু খুঁজছেন—
But Him I seek, the Still and Perfect One
The Sun, not rays

কবি জবাব দিলেন—

Seek Him upon the Earth
এইখানেই ই হৈব—
The night is on thy soul
তোমার আত্মায়, রাত্রির ছাপ—
Then raise up Man the lover to God the goal

> তুলে দাও প্রেমিক মানুষকে সেই সবশেষের দেবতার আসনে তুলে
> এই তো সমঞ্জসা রতি এই যে—একের জন্য আর একজনের আস্পৃহা
> (Yearning of the One for the One)

এই গভীরতম প্রেমের কথাই তাঁর কাব্যে ব্যাপৃত হয়ে আছে। রুরু ও প্রিয়ংবদার উপখ্যানে, উর্বশীর কাহিনীতে, রাধার স্বপ্নে, সাবিত্রীর অভীপ্সায় এই মানুষী প্রেমকে অতি মানুষী অনির্বচনীয়তায় নিয়ে গেছেন কবি। অন্যত্র আমি দেখিয়েছি যে, বিশ্বের তিন মহাকবি—রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও কালিদাস উর্বশীকে কি রকম বিচিত্রভাবে চিত্রিত করেছেন। একজন তাঁকে দেখলেন "নহ মাতা নহ কন্যা, নহ বধূ" বিশ্বের প্রেয়সী রূপে 'ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা যাঁর চরণ শোণিমা,' আর একজন দেখলেন প্রেমে মহীয়সী ও শ্রেয়সী অশঙ্কিনীকে— আর অপরজন তার প্রেমকে গরীয়সী করে তাকে পূর্ণতায় ফুটিয়ে তুললেন মাতারূপে—সে শুধু বিশ্বের কামনা-রাজ্যের নেত্রী নয়। অসামাজিক প্রেম জায়া ও জননীর মাধ্যমেই সার্থকতা পায়, কারণ পুত্রই সমাজধারার বাহক, তার অভিজ্ঞান—সে অভিজ্ঞান যদি হারিয়ে যায় তাহলে প্রেমের সার্থকতা থাকে না। কালিদাসের উর্বশী পুত্রকে দেখে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, ভাবে, কত বড়টি হয়েছে আমার ছেলে অয়ং মে পুত্রক আয়ুঃ, মহান্ খলু সংবৃত্তঃ। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী ফেরেনা, কিন্তু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে, যদিও আকুল ব্যথায় মন বলে—ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী, অস্তাচলবাসিনী উর্বশী। অরবিন্দের উর্বশী ফেরে—

> She is but gone for a little gone
> But she will soon come back
> Even if her heart would let her linger
> Mind would draw her back.

প্রেমের মানস সাধনাতেই জয়ী হয় পুরূরবার শক্তিমান্ প্রেম। কালিদাসের উর্বশীও মানুষী হয়—অনপ্সরেব সে প্রতিভাসি—সে প্রিয়া, সে জায়া, সে জননী, সে মাতা—যখন নারদ এসে সংবাদ দেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র তাকে পুরূরবার সহধর্মচারিণী রূপেই বাস করতে অনুমতি দিয়েছেন, তখন তার হৃদয় থেকে যেন শল্যই উৎপাটিত হ'ল—সম্ম বিঅ হি অ আদো অবনীদং।

'উর্বশী' ও "প্রেম ও মৃত্যু" দুই কাব্যেই ভবিষ্যজ্জীবনের ছায়া পড়ছে। দুটিই হচ্ছে জীবনের কবিতা, প্রেমের কাব্য—পরমতম ঘনিষ্ঠতন প্রেমের অভিব্যক্তি। 'উর্বশী' কবিতায় প্রেম প্রথমে অসার্থক হয়েছিল কিন্তু শেষে জয়ী হ'ল। 'প্রেম ও মৃত্যু' কবিতায় প্রেম সার্থকতার সন্ধান পাবার আগেই দুরন্ত কালের দংশনে মৃত্যুর ছেদ এসে গেল। কিন্তু রুরুর প্রেম সে বিচ্ছেদকে অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, সে চলে গেল মৃত্যুর পুরীতে। যাবার পথে মদনের সঙ্গে তার দেখা—মদন তাকে ইঙ্গিত দিলে—দেবতারা জানে শুধু একটি কথা—ত্যাগ—(sacrifice), কিছু না দিয়ে তুমি কিছু পাবে না। নিজের জীবনের অর্ধ দিয়ে মৃত্যুর কাছ হতে রুরু প্রিয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। এর মধ্যে নচিকেতার ঊর্ধ্বাভিমুখী জ্ঞান-অভীপ্সা নেই বটে, সাবিত্রীর বিরাট্ পটভূমিকা বা একাগ্র তপস্যার জ্যোতিও নেই, কিন্তু প্রেমের কাছে, ত্যাগের কাছে, মানুষের মানস অভিযানের কাছে, মৃত্যুকে হার মানতে হয়েছে, এইটেই বড় কথা। মানুষের প্রেম, তার অনন্তজ্যোতির যাত্রা-পথে যে নিত্যসাধনা, তার অনাদ্যন্ত অধ্যাত্ম জীবন, তার যে অগ্নিময় ঊর্ধ্বগতি, যে সীমাহীন কাল চেতনা 'টাইম্ স্পেস্, কন্টিনিউয়াম' এর ঊর্ধ্বে প্রবাহিত, সেই মহাকালের কোলে মহাকালীর যে লীলা চলছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য "সাবিত্রী"।

চতুর্থ উল্লাস

সাবিত্রীর কবি শ্রীঅরবিন্দকে জানতে হলে তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের ও কিছু নিবেদন আবশ্যক। শ্রীঅরবিন্দ-সাহিত্য প্রায় সমস্তটাই ইংরাজীতে লেখা এবং এর বিপুল পরিধি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তিনি শুধু কবি নন, তিনি নাট্যকার, ভাষ্যকার, দার্শনিক প্রবক্তা, উৎকৃষ্ট সমালোচক, মননশীল গদ্যলেখক এবং তার উপরে তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁর সাহিত্য সম্ভারের নানারূপ এবং তাকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। কবি হিসাবে তিনি ছোট্ট কবিতা লিখেছেন, সনেট লিখেছেন, বড় কবিতা, এপিক বা মহাকাব্য ও তাঁর উপজীব্য। তিনি শুধু তৎকালীন ইংরাজী সাহিত্য বা ইউরোপীয় সাহিত্য দ্বারাই প্রভাবিত হন নি—প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যে (অর্থাৎ ক্ল্যাসিস্-এ) তাঁর দখল ছিল অবিসম্বাদী-ভাবে স্বীকৃত। তিনি মিত্রাক্ষরে লিখেছেন, অমিত্রাক্ষরে, (ব্ল্যাঙ্ক্ ভার্স) তাঁর হিরোয়িক্ পয়েম আছে, নানাধরনের ছন্দ নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন যেমন হেক্সামিটারে। তিনি অনুবাদক, তিনি অনু-লেখক। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী, মহাভারতের 'বিদুলা' কাহিনী, ভর্তৃহরির নীতিশতক, আরব্য উপন্যাসের 'বসোরার উজীররা' ভাসের ছায়ায় বাসবদত্তা, গ্রীক পুরাণের অনুকরণে 'রদোগুণে', ইলিয়ন, নর্ডিক ড্রামা 'এরিক', প্রাচীন কেল্টিক্ প্রথা মত 'প্রিন্স অফ এডুর' হাউস অফ্ ব্রুট' দি মেড ইন দি মিল' মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতের বাজী-প্রভু' নব নব প্রতিভার উন্মেষশালিনী বার্তা নিয়ে আসে। এমন কি বিদ্যাপতির গান, জ্ঞানদাসের পদ, নিধুবাবুর টপ্পা, হরুঠাকুরের গীতও তিনি অনুবাদ করেন। মাতিলার গান, উর্বশী, প্রেম ও মৃত্যু, পরিত্রাতা পার্সিউস, সাগরসঙ্গীত, মহালক্ষ্মী' ঋগ্বেদের অগ্নিস্তব, আহানা এবং অন্যান্য নানা কবিতা যা ছড়িয়ে আছে (More Poems, Last Poems প্রভৃতি কাব্যসঞ্চয়নে) এক বিরাট বিশাল কাব্যসৃষ্টিরই পরিচায়ক। তারই পরি-প্রেক্ষিতে সাবিত্রী মহাকাব্যের পরিকল্পনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন। তাঁর বরোদাবাসের যুগ থেকে এর প্রস্তুতি—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাব্যসাধনা চলেছে—বলা যায় যে, তাঁর সাধনার মূর্ত রূপই এই কাব্য।

অনন্তের যে সুর তিনি কানে শুনেছেন, যে চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন, অসীমের ও অচিন্তনীয়ের যে লীলা তাঁর মানস-দৃষ্টিতে এসেছে তাকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন সঞ্চারিণী বাক্ বিভূতিতে—নিন্যাং বচাংসি। কবির রূপজ মোহ বা বুদ্ধিজ দৃষ্টি পেরিয়ে তিনি বোধিদীপ্ত চেতনাতে অন্তরঙ্গ রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন—সে দর্শন তৃতীয় নয়নের দর্শন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, তারই অনুবৃত্তি করে বলা যায় যে, যাঁরা লোকোত্তর শিল্পী তাঁরা অপরূপ অভিনব ঐক্যতান সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ, তাঁদের চেতনা শুধু বহুতর চেতনার সমষ্টি নয়—সেই চেতনাগুলি যতই এক-মুখী, সংযত, সংহত ও সুনিবদ্ধ হবে, ততই গভীর গাঢ় ও অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্ত্য ক্রিটিকরা একে 'মিষ্টিক' পোয়েট্রি বলেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন। তত্ত্বের দিক্ থেকে 'সাবিত্রী' কারো কারোর কাছে দুর্বোধ্যও হতে পারে, এপিকের গঠনশৈলী (ষ্ট্রাক্‌চার) হিসাবেও এই মহাকাব্যটি এক রহস্যময় নূতন দিক্ খুলে দিতে পারে, কিন্তু মূল বক্তব্য হচ্ছে কাব্য হিসাবে কোন দিক্ দিয়ে এটি সার্থক। এই বিরাট কাব্যটি তিনটি খণ্ডে, দ্বাদশটি পর্বে, উনপঞ্চাশ সর্গে বিভক্ত। কবি স্বপ্ন দেখছেন নূতন জগৎ, নূতন মানুষ, নূতন ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে—সেই মহা গৌরবের সমুজ্জ্বল চিত্র তিনি আঁকছেন, এইতো কাব্যের সার্থকতা। একজন আমেরিকান কবি বলেছেন—

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken winged bird
That cannot fly.

স্বপ্ন মানেই অবচেতনে যা আছে তাকে ফিরে পাওয়া, আত্ম আবিষ্কার, তাকে অধিচেতনে পাওয়ার আত্ম সাধনা।

আরম্ভ সুরু হলো প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্বের প্রথম সর্গে—উষার প্রতীক দিয়ে আরম্ভের গুহ্যতম জ্ঞানকে জানতে হবে—পাঁচটি সর্গ। কবি সেই আবাহনী গাইলেন। দ্বিতীয় পর্বে সুরু হলো—যাত্রী মানুষের অভীপ্সার ছন্দ—সে চলেছে একক—Alone he moved,

watched by Infinity. পৃথ্বীর পর পৃথ্বী অতিক্রম করে—পনেরোটি সর্গে বিস্তৃত এই মানস যাত্রার কাহিনী। যোগী অশ্বপতির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল সেই অখণ্ডের ছন্দ যার সঙ্গে তিনি একাত্ম He was one spirit with that Immensity, A seer who knows the ordered plan. জেনেছেন কিন্তু মহতী প্রাপ্তি হয়নি, নৈঃশব্দের চূড়ায় উঠেছেন (boundless silence of the self) কিন্তু এ হচ্ছে নেতিত্বের গিরিশৃঙ্গমালা তুঙ্গীনাথের সমাহিতির তীর্থ. কিন্তু প্রেমের স্বীকৃতি কই? (where is the lover's everlasting yes ?)। তৃতীয় পর্বের নামকরণ হলো—দিব্যা জননীর কাহিনী (The Book of the Divine Mother) মানবাত্মার প্রতীক অশ্বপতি মায়ের আশীর্বাদ পেলেন আত্মার সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে স্থূল মর্ত্য আবরণের উপর। সাবিত্রীর হবে জন্ম—তাঁর কথা বললেন কবি দ্বিতীয় খণ্ডের পাচটি পর্বে—চতুর্থ থেকে অষ্টমে। জন্ম, সন্ধান, প্রেম, নিয়তি, যোগ, মৃত্যু। তৃতীয় খণ্ডের নবম পর্বে দুটি সর্গে আমরা সাবিত্রী-সত্যবান্ উপাখ্যানের সেই বিখ্যাত সংবাদ ও তার তাৎপর্য দেখি—ঘন তামসী রাত্রির মধ্যেই মানবাত্মার অভিসারযাত্রা। দশম পর্বে চারিটি সর্গ, তার মধ্যে তৃতীয় সর্গে আমরা পাই—যমরাজের সঙ্গে সাবিত্রীর কথোপকথনের ইতিহাস—দ্বন্দ্ব চলেছে, বিতণ্ডা চলেছে, মৃত্যুর দেবতা ও প্রেমের মহীয়সীর সঙ্গে। একাদশ পর্বে দেখা গেলো প্রেম হয়েছে জয়ী। দ্বাদশ পর্বটি বিজয়িনী সাবিত্রীর জীবিত স্বামীকে নিয়ে পুনরাগমন—অর্থাৎ দিব্যাশক্তির পুনরায় অবতরণ (A power leaned down......) এবং এই রক্তমাংসের কামকামনার "অনিত্যম্ অসুখম্" লোকের জন্য নূতন মন্ত্র, নব বিশ্বাসের বার্তা, বৃহত্তরা ঊষার স্বর্ণদ্বার খোলবার চিরকালীন আমন্ত্রণ নিয়ে এলেন সাবিত্রী—

And in her bosom nursed a greater dawn

সাবিত্রী সেই সত্যকেই লালন করছেন তাঁর হৃদকমলে। শতপুত্রবতীর বরকে সফল করতে গেলে তাঁর মধ্য দিয়েই নব নব সত্যবানের জন্ম দিতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে এই অভীপ্সা, ঊর্ধ্বমুখী চেতনার বার্তা। এই সাবিত্রী'ব্রত পালনের মন্ত্রই দিলেন কবি শ্রীঅরবিন্দ। উপনিষদে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন—সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে তার

প্রতিষ্ঠা কোথায়। দালভ্য বলেছিলেন—এই পৃথিবীতে স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়। প্রবাহন জবাব দিয়েছিলেন—তাহলে তোমার সত্য ত অন্তবান্ হলো, সীমায় এসে ঠেকে গেলো যে। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীটি মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করে তার কবিধর্মের সীমানার রূপটি কি রকম বোঝাতে চাইতেন তাঁর কলাবধূর গুণ্ঠনখানি কতদূর টানা হবে। কবি গাইলেন—

আমি লিখি কবিতা, আমি আঁকি ছবি
দূরকে নিয়ে আমার সেই খেলা
দূরকে সাজাই নানা সাজে
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়
যে কাজে আছে দূরের দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতিমুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ

অর্থাৎ তিনি প্রবাহন, বহন করে নিয়ে চলেছেন সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূর ক্ষেত্রে। এই অগাধে দীক্ষাই হলো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা। শ্রীঅরবিন্দও এই সাধনাকে গ্রহণ করলেন অন্যদিক্ দিয়ে। সীমা শুধু অসীমে যাচেছ্ না। সবই অসীম অনন্ত, অরূপ। প্রত্যেক হৃদয়েই আছেন সেই একক লুক্কায়িত In every heart is hidden the myriad One—বেদাহমেতং, শুধু মহান্ত পুরুষকে জানা নয়, যিনি তমসের পরপারে, আমি জানি যে আমিই আমি, আমিই তুমি—সুহ বা সুহ, বা সুহ তিনিই তিনি, তিনিই তিনি—I know that every being is myself ; সন্ত দাদুর কথায় আছে।

গৈব মাঁহি গুরু দে মিলা পায়া হাম পরসাদ
মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হম্ অগাধ।

রন্ধ্রহীন অন্ধকার ভেদ করে আমার গুরু আলো হয়ে প্রকাশিত হলেন—আমি কিছু পেলাম তার প্রসাদ, তিনি আমার শির ধরে করলেন আশীর্বাদ—আমার হলো অগাধে দীক্ষা, দরশে পরশে এল প্রেমবৈবশ্য।

প্রেম পিয়াসা নূরকা আসিক ভর দীয়া
মৈ মততয়ালা কীয়া

জ্যোতির পিয়ালায় প্রেমময় তার প্রেম ভরপুর করে দিলেন, আমি হয়ে গেলাম মাতাল। এই রসায়ন পান করেই আলোক মাতাল মানুষ।

হরে পটংবর পহিরি করি, ধরতি করে সিংগার। তাইতো সবুজ পট্টবাস পরে ধরিত্রী এমন শৃঙ্গারময়। অরবিন্দ সাধনার মূল উদ্দেশ্য রূপান্তর সাধন, কিন্তু ভারসাম্য না হারিয়ে। তাই অরবিন্দ কবিতার যুগে যুগে ঋতু পরিবর্তন যে হয়নি তা নয়, প্রকাশের রীতি কিছু বদলেছে, কিন্তু তাঁর বৃহতের, মহতের, ভূমার আকৃতি বদলালেও প্রকৃতি বদলায়নি। কবি পরিণতি সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়। মানুষের মধ্যে যেমন বয়সের সীমা ও সীমানা আছে, কাব্যেও দেখা যায় বাল্যের চপলতা, যৌবনের জোয়ার, প্রৌঢ়ত্বের স্থিতি ও বার্ধক্যের প্রলেপ। অনেক সময় দেখা যায় অনুভূতির তীব্রতা কমে এসেছে বটে, কিন্তু স্থৈর্যের, ব্যাপ্তির, প্রাপ্তির স্নিগ্ধতায় তার কলস উঠেছে ভরে। চারজন কবির কথা উল্লেখ করেছেন তিনি—ব্লেক, ইয়েটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও র‍্যাঁবোর কথা। এর সঙ্গে আমরা যোগ করে দিতে পারি রিল্কে ও ম্যালার্মের কথা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রথমদিকের ও শেষের দিকের কবিতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উত্তর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কথামালার মালাকর। ইয়েটসের মধ্যেও দেখেছি অদ্ভুত দ্বন্দ্ব between self and soul, শেষের র‍্যাঁবোর মধ্যেও অস্তগমনের সূচনা। ম্যালার্মের লেখায় যখন পড়ি যে জমাট বরফের মধ্যে আটকে গেছে তার রাজহংস, পাখা নাড়তে পারছেনা, উঠতে পারছে না, ঝাপটা মারতে পারছে না, তখনই মনে হয় এ যেন বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার একটি বাঙ্ময় প্রতীক কল্পনা করেছেন কবি। রিল্কের Sonnets to Orpheus এ নানা প্রতীকের সাহায্য নিয়েছেন কবি। অরবিন্দ কাব্য প্রতীকধর্মী হলেও শেষবয়সের অবসাদ প্রলেপ পড়েনি সেথায়, আমরা দেখেছি এক ধরনের ক্লান্তিহীন স্থৈর্য, ও শ্রান্তি -হীন মহিমা যা কাব্যসুষমাকে মণ্ডিত করেছে এক চতুর্থ স্তর-বিভাগে, যেখানে আমাদের মধ্যেই সব আছে—আবার আমরাই সর্বত্র, সর্বগ, সর্বানুভূ, তেজোময়, অমৃতময়।

A fourth dimension of aesthitic sense
Where all is in ourselves and ourselves in all

শ্রী অরবিন্দ কাব্যে ভগবানের প্রতি ভক্তের মুগ্ধ নিবেদন নেই, আছে সমানে সমানে খেলা—তোমার আলোই আমার আলো—দুই মিলিয়ে খেলা হবে—আরতির বাতি নয়।

অরবিন্দ কাব্যের আর একটি দিক্ থেকে বলা যায়, বিশেষ করে পরিণত বয়সের "সাবিত্রী"তে কবির বাক্যচয়ন একটি শিল্পকলায় দাঁড়িয়ে গেছে, সেখানে অবসাদের বা শুধু কথার পর কথা গাঁথার কোন লক্ষণ নেই—বরং মন্ত্রের মত যেন ঐ বাক্যসমুচ্চয় গুলি সমুদ্ভাসিত।

(১) When all is won or all is lost for Man
(Savitri)

(২) An ecstasy and laughter and a cry
A power leaned down—a happiness found
its home. (Savitri)

(৩) I will use thee as my sword as My lyre
(Savitri)

(৪) Two are the ends of existence, two are
the dreams (Ahana)

(৫) A face on the dire mountain peaks
Grand and still, its lines white and anstere
Above it a mountain of matted hair
(Shiva)

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, যদিও তার প্রথম যুগের কবিতাগুলি (যেমন মাতিলার গান) 'essentially English' বলে অভিনন্দিত করা হয়েছিল, তবু তার পরের যুগের কবিতাগুলি সহজবোধ্য নয়। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই—এই কাব্যিক রীতিও অচল। বন্ধুবর ডঃ শিশির কুমার ঘোষ ঠিকই বলেছেন "The modern English reader will find it hard to relate his mystical afflatus with his own social history

or the poetry with which he is familiar. He may have even inherited or cultivated, an allergy to this kind of writing, which is far from fashionable (p. 77—The Poetry of Sri Aurobindo).

কাব্য ছাড়াও তিনি নাটক লিখেছেন, গদ্যে তাঁর রচনাগুলিকে বলা হয় massive বা ভারী ওজনের। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক রচনা হিসাবে তাঁর দিব্যজীবন (Life Divine) এবং গীতাভাষ্য (Essays on Gita সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত। তার যোগসমন্বয় (Synthesis of yoga). The Human Cycle. The Ideal of Human Unity, War, and Self—Determination তাকে একাধারে ঋষি ও ভাষ্যকার করে তুলেছে। বেদ সম্বন্ধে তাঁর নিবন্ধগুলি নূতন ভাবে বেদকে আলোকিত করে প্রতীক হিসাবে। তার ভবিষ্যৎ কাব্য (Future Poetry) বা পত্র সাহিত্য তাঁকে সমালোচক শ্রেষ্ঠদের মধ্যে আসন দেবে। তাঁর কালিদাস ও সেক্সপীয়ার (প্রবন্ধ সংকলন) তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি (The Foundations of Indian Culture) একটি বিশিষ্ট বই। উইলিয়াম আর্চার নামে একজন ব্রিটিশ সমালোচক যখন ভারতীয় কৃষ্টির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন তখন "আর্যে" শ্রীঅরবিন্দ যে প্রবন্ধগুলি লেখেন তারই ভিত্তিতে এই পুস্তক। এটির একটি ক্যানাডিয়ান সংস্করণও কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ এখানে ভারতীয় চিন্তার, চেতনার, শিল্পবোধের, সাহিত্যের, কৃষ্টির একটা সামগ্রিক মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনা হিসাবে কারাকাহিনী, জগন্নাথের রথ, ধর্ম্ম ও জাতীয়তা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটি গল্পও তিনি রচনা করেছিলেন। স্ত্রীর প্রতি পত্রগুলিও তাঁর চিন্তাধারাকে বুঝতে সাহায্য করে। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে কতো লেখা যে ছড়িয়ে আছে তা বলা যায় না। ত্রিশ খণ্ডে তার সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে তা থেকেই প্রতীয়মান হবে যে কী বিস্তর তাঁর চিন্তার ধারা। এদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে তুলনীয়। বেদ, গীতা, যোগ, দার্শনিক তত্ত্ব, সামাজিক উন্নয়ন, মানবিক ঐক্য, ভারতীয় সংস্কৃতি—কবিতা, নাটক, পত্রাবলী–ছোটগল্প (The Phantom House, The Golden Bird, The Devil's Mastiff প্রভৃতি), অনুবাদ

সাহিত্য. বক্তৃতা, রাজনৈতিক নিবন্ধ—সর্বত্রই তার দক্ষিণ পাণি প্রসারিত।

অরবিন্দ কাব্যের শেষ কথা, শেষ পরিণতি 'সাবিত্রীতে'—সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে ঐ কাব্যমহাসাগরে। এই magnum opus-এ আমরা শুধু কাব্য, ছন্দ, ভাষার বিন্যাস, রূপায়ণের, চিত্র কল্পনার প্রাচুর্য, চিন্তার প্রখরতা, অসীম বিস্তার, ভাবের গাম্ভীর্যই পাই না, এখানে দর্শন, কাব্য, সাধনার ত্রিকাল ত্রিকায়ে এসে মিশেছে অনন্তের রাজ্যে, অনির্বাণের পথে, অচিন্তনীয়ের সুরে। মানুষের প্রেম, তার অনন্তজ্যোতির যাত্রাপথে যে নিত্য সাধনা, তার অনাদ্যন্ত অধ্যাত্মজীবন, তার যে অগ্নিময় ঊর্ধ্বগতি, যে সীমাহীন কাল Time space, Continuous-এর ঊর্ধ্বে প্রবাহিত, সেই মহাকালের কোলে মহাকালীর যে লীলা চলছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সাবিত্রী'।

কাব্যের প্রচলিত ধারণা ও সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করলে এর মধ্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি দেখা অসম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ এখানে "thinks too much, thought comes in...and profoundity keeps out poetry.' কেউ বললেন যে, কাব্যের সাজ পরিয়ে 'perennial philosophy' পরিবেশন করলেন শ্রীঅরবিন্দ। সেইজন্য কাব্যহিসাবে সাবিত্রী ব্যর্থ না হলেও সার্থক নয়, স্পষ্ট নয়, বরং বিভ্রান্তিকর, কারণ এর রূপায়ণগুলি বা imageries কষ্ট-কল্পিত। কিন্তু যাঁরা এইরূপ মন্তব্য করে থাকেন, তাঁরা শ্রীঅরবিন্দ কাব্যের যে বিরাট পরিধি সেটা ভুলে যান—এ হচ্ছে—Grand Saga of Eternity—এখানে কবির দৃষ্টিতে—Sweep of the worlds'—the Surge of the ages—'অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি'। সেইজন্য বলা যেতে পারে "when it is not understood, it is because the truths it express are unfamiliar to the ordinary mind or belong to untrodden domain or enter into a field of intuitive experience. It expresses a vision by identity, i.e., by entering into it. এই কাব্যের উপমা বা সত্য বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টকর, কারণ এ পথের কথা অজানা পথের কথা—একে সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে সে রাজ্যে পৌঁছতে হয়—যে ছবি আঁকা হচ্ছে তার সঙ্গে একাত্ম হতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'কে মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালার ভাষায় বলা যেতে পারে

মহোঅর্ণ: সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা

ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি (ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল তৃতীয় সূক্ত ১২) বৃহতের মহাসাগর আপন রশ্মি দ্বারা যিনি রঞ্জিত করে তুলেছেন, সজ্ঞান করেছেন, উদ্ভাসিত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যজিজ্ঞাসার মূল সূত্রটিকে খুঁজতে গেলে এই আলোকোজ্জ্বল প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত মানসের মধ্যেই তার অখণ্ড রূপটিকে পাওয়া যায়, যে অলোক আলোক শুধু মনের জগতেই ক্রিয়া করছেনা, বাইরের জগতেই প্রতিফলিত হচ্চে না, রূপান্তরিত করছে দৃষ্টিভঙ্গিকে, সমগ্র সত্তাকে, সমস্ত চিন্তার ধারাকে। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। অনেকের মতে আজকের যুগে মহাকাব্যের দিন ফুরিয়েছে। এখন গতি আর প্রগতির যুগ, বিরামহীন, বিশ্রামহীন। সে দীর্ঘদিবস, দীর্ঘরজনী, দীর্ঘবরষমাস নেই—জীবনে এসেছে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের দিন, জীবিকার জন্য হাহাকার। এখন কি আর রসিয়ে জরিয়ে শুয়ে বসে ভাবে ভাষায় মহাকাব্যের কল্পনাবিলাস চলে—সে সময় নেইই, মনও নেই, মননও নেই, আর নেই মনের সেই উত্তুঙ্গী আভিজাত্য। কথাটা হয়তো সত্য কিন্তু তবু দেখছি আজকের যুগেও বিরাট কাব্য লেখা হবে।

কবির কাব্যবিচারে অন্য কবিদের parallel passage উদ্ধৃত করা বা তার তুলনামূলক সমালোচনা একটি রীতি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের, সাবিত্রীকে ঠিক ঐ তুলাদণ্ডে মাপ করা যায় না। দান্তের 'Divina Comedia', মিলটনের Paradise Lost, টমসনের 'Kingdom of God', গ্যয়টের 'Faust' এর নাম অনেকে করেন এবং ব্যাস ও বাল্মীকি, হোমার ও ভার্জিল, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, ব্লেক, Wordsworth, অশ্বঘোষ, Aldous Huxely, Echhart, Ruys-brock, আঁরি বের্গসর প্রভৃতির লেখা উদ্ধৃত করেন। অবশ্য ব্যাস ও বাল্মীকিতে ও বৈদিক কাব্যে আমরা পেয়েছি, শ্রীঅরবিন্দের ভাষাতেই—It is the old struggle. হোমারে—ভার্জিলে বিরাট পরিধি ও pagan outlook, রবীন্দ্রনাথে রুচির—রম্যের, সুরের ও সুন্দরের, উন্মুখী মর্ত্যমনের আলোর সন্ধান, অশ্বঘোষে 'প্রজ্ঞাম্বুবেগাং স্থিরশীলবপ্রাং সমাধিশীতাং ব্রতচক্রবাকাং অস্যোত্তমাং—প্রজ্ঞা নদীর কূলে বোধির সাধনা স্বর্গ, ব্লেকের কাব্যে স্বর্গ

ও নরকের মিলন গীতি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে intimations of immortality, এ্যালডুস হাক্সলিতে যোগের ইঙ্গিত এবং কালিদাসে একটা ঘন আবেগময় ঐশ্বর্যময় অনুভূতি hedonistic impulse. কবির কাব্য-উর্বশী নূপুর চঞ্চলা হয়ে নৃত্য করে চলেছে, কিন্তু সেখানে ইন্দ্রিয়জ—বিবেকজ বুদ্ধির প্রাবল্যই বেশী। তবু তিনি মাতৃশক্তিতে বিশ্বাসী, পার্বতী পরমেশ্বরের উপাসক। তাঁর বিদ্যুন্মালা, শালিনী, মন্দাক্রান্তা, শিখরিনী ছন্দ ভরতবাক্যে নান্দীবাক্যে বা স্মৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা সর্ববীজ প্রকৃতিরই গীত গেয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আর এক মহাকবি ও মহাযোগীর নাম শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখ করা উচিত—তিনি আচার্য শংকর—যদিও তাঁর তথাকথিত মায়াবাদকে রামানুজের পরে অপূর্বভাবে খণ্ডন করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। প্রায় 'সাবিত্রীর' কিছুটা সমধর্মী একটি কাব্য The Odyssey—A Modern sequel সম্প্রতি আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ খণ্ডে, ৩৩,৩৩৩ লাইন সুগম্ভীর কবিতায় গ্রীক্ কবি Nikos Kazantazakis এই অপূর্ব কাব্য লিখেছেন। হোমর যেখানে শেষ করেছেন সেইখানে এঁর আরম্ভ। তাঁর নায়ক সব ধ্বংস করে সুন্দরী হেলেনকে নিয়ে ইথাকা ছেড়ে চললো আফ্রিকায়, পৌঁছলো দক্ষিণ মেরুতে। মাটি, জল, আগুন, বাতাস, মন তাকে আচ্ছন্ন করলে, কিন্তু সে মুক্তি চাইলে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে—

Fire will surely come one day to cleanse Earth
Fire will surely come one day to make mind ash

অনেকেই বলে থাকেন আজকের যুগের লেখার ভঙ্গি, রচনাশৈলী, কাব্যের স্বরূপ, দীর্ঘের পরিধিতে রসোত্তীর্ণ হয় না। জানি না, এই রসোত্তীর্ণ কথাটা বলতে যত সহজ, বিচার-বুদ্ধির পরিমাপে তত সহজ ও সাবলীল কিনা। আমরা কথায় কথায়, সাহিত্যবিচারে বলে থাকি—এই লেখাটি রসোত্তীর্ণ হয়নি—অর্থাৎ এক কথায় আমার ভালো লাগেনি বা আমি বুঝিনি। কিন্তু এই ভালো লাগার মানদণ্ডটি কি—সেটা কি নির্ভর করেনা শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ প্রভাব, পরিবেশ, কাল, চিন্তার ধারা, মানসিক প্রস্তুতি, বিচারবুদ্ধির সুষ্ঠু রূপের উপর। যে কাব্য আমার পিতামহের দিনে, যে সাহিত্য রসসমৃদ্ধ মনে হতো আজকের দিনে তা হয়তো সেইরকম সাড়া জাগায় না। কিন্তু একথা ঠিক সাহিত্যে

যখনি কোন জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটা হচেছ তাঁর নিজস্ব কৌলীন্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় কাব্য সাহিত্যের বিচার তার বিষয়বস্তুর গৌরবে বা মহান্ আদর্শে নয়, রূপকারের কৃতিত্বে, ধ্বনির আলোকে। আলঙ্কারিকরা বলবেন এই ধ্বনিই হচেচ কাব্যের প্রাণ, রমণীদেহের লাবণ্যের মত। এই ধ্বনির যে কল্লোল তা শুধু স্থূল শ্রবণের গ্রাহ্যই নয়, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রাজ্যেও প্রবেশ করে অধিকারী ভেদে। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্যের সার্থকতা কোথায়' এই প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে টি এস এলিয়টের 'On poetry and poets' সম্বন্ধে একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে যা উল্লেখযোগ্য—It has been the rule that great poets should look for their own aesthetic principles and that they should become to this extent philosophers or borrowers of philosophy. এই নিজস্ব রসজ্ঞাননীতি ও তার প্রকাশ পাঁচজনের কানে যদি বেসুরো বাজে, তাহলে ?

সাবিত্রীর ছন্দ, শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষায় ? 'a blank verse without enjambment (except rarely)—each line a thing by itself and arranged in paragraphs of one, two, three, four, five lines (rarely a longer series) in an attempt to catch something of the Upanishadic and Kalidasian movement so far as that is a possibilsty in English.' অমিত্রাক্ষর ছন্দ বটে, কিন্তু এমন ভাবে তার বিন্যাস যে উপনিষদের ও কালিদাসের গাম্ভীর্য ও সাবলীলতা যেন থাকে, অবশ্য যতদূর ইংরাজীতে তা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীকার করছেন এই ছন্দোবদ্ধতা বা Rhythm Structure বা ছন্দসংগঠন 'মডেল' হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী থেকেই এর একটি অনুপম উদাহরণ দিই। সাবিত্রীর ষষ্ঠ পর্ব, প্রথম সর্গ—Book Six, Canto one—নারদ স্বর্গ হতে মর্ত্যে নামছেন

In silent bounds bordering the mortal's plane
Crossing a wide expanse of brilliant peace

Narad the heavenly sage from Paradise
Came chanting through the large lustrous air.
Attracted by the golden Summer earth
That lay beneath him like a glowing bowl
Tilted upon a table of the Gods,
Turning as if moved round by an unseen hand
To catch the warmth and blaze of a small Sun
He passed from the immortal's happy paths
To a world of toil and quest and grief and hope,
To these rooms of a See-Saw game of death
The World of Fate and Life.

কবি সেই অবতরণের ছবি আঁকছেন। অম্বরে ধরায় আকাশে বাতাসে, কৈলাসে বৈকুণ্ঠে এই দেবর্ষির অবাধ গতি। বীণাহাতে হরিগুণগান করতে করতে তিনি লোক থেকে লোকান্তরে গমন করেন। এই রকম একটা ছবি কাব্যে, পুরাণে, নানা কথা ও কাহিনীতে আমরা পেয়েছি। লৌকিকতায় তাকে কোন্দলের গুরু বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু মানসলোকে তিনি যে শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্তরের একজন উচ্চাধিকারী সে-বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নারদের অর্থই হচ্ছে নরের আশ্রয় যিনি, যে নর মুক্তিকামী, যে মানুষ তর্ক করে, যে মানুষ বুঝতে চায়, বোঝাতে চায়। কবির অনুপম কল্পনায় ফুটে উঠলো ঋষিপ্রবর নামছেন মর্ত্যের দিকে, মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে, শতসহস্র সূর্য ঘুরছে, গড়ছে, ভাঙছে, অসীম সাগরের নর্তন চলছে। এই মর্ত্যসীমার পারেই (bordering the mortal plane) বিরাট শান্তির পারাবার (a wide expanse of brilliant peace)—ঊর্ধ্বে চতুর্দিক্ আলোয় উদ্ভাসিত—নিম্নে নিমীল এই পৃথিবী—একটা অদৃশ্য শক্তির হাতে ক্রীড়নকের মত ঘুরছে—একটা ছোট্ট সূর্যের উত্তপ্ততা নিয়ে. উপমা দিলেন কবি—Tilted upon a table of the Gods. কবি বলছেন তাঁর এই পৃথিবীতে নামা মানেই

He passed from Mind into material things
Amid the inventions of the Inconscieut self

তিনি মানস স্তর থেকে জড়ের স্তরে এলেন যেখানে দুঃখ আছে, বেদনা আছে, মৃত্যু আছে, জীবনের গোলকধাঁধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে—কিন্তু এইখানেই আছে, এই অগ্নির মধ্যেই আছে জাতবেদের প্রচ্ছন্ন শক্তি, সৃষ্টির গুহ্যতম রহস্য,—

The Secret Might of the Creative Fire

এই অগ্নি শুধু ত ধ্বংস করে না, কালোর রেখা রেখে যায় না, আলোতেও দীপ্যমান করে তোলে উর্ধ্বের অভীপ্সা, লেলিহান শিখায়। বৈদিক ঋষি জীবনযজ্ঞের এই প্রথম প্রতীককে বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তাকে আবাহন করেছিলেন, তাকে অগ্রণী করে এগিয়েছিলেন, পুরোহিত করেছিলেন। দেবর্ষি এই সংকোচশীল ও পরিবর্ধনশীল (contracting and expanding) পৃথিবীতে নামতে নামতেই অনুভব করেন জীবনের ও মৃত্যুর পরিধিকে,

He felt a sap of life, a sap of death

অনন্তের মহাশূন্য দিয়ে আসতে আসতে তিনি সৃষ্টিকর্তার কাজ দেখতে লাগলেন—কত পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারকা নীহারিকার দল গড়ছে ভাঙছে সৃষ্টি, লয়-বিলয় হচ্ছে প্রলয়ে—কত রূপ, কত রূপান্তর—হয়তো বা তার ভিতর কিছু আছে যা অসম্পূর্ণ

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

আজি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড
বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ

কিন্তু কবির আশা

অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি
ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার
অন্তর্গূঢ় সংকল্পধারা
(রোগশয্যায়)

His eyes measured the spaces, gauged the depths
...He saw the eternal labour of the Gods

এই মন্ত্রই পাঠ করেছেন মূর্তিকার শ্রীঅরবিন্দ দেবর্ষি নারদের মত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানের সুর বদলে যেতে আরম্ভ করলো, তাঁর বীণার অনাহত ধ্বনি অন্য মূর্চ্ছনা ধরলে—তার মধ্যে এলো ভাবের রস, অনুকম্পার প্রেরণা—মাটির সঙ্গে যার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—সেই চিরভাস্বরের গান আর কণ্ঠে আসছে না—

He sang no more of light that never wanes
He sang no more of the deathless heart of love

প্রেমের যে অবিনশ্বর শাশ্বত রূপ তাও মনে পড়ছে না। এখানে অজ্ঞানের সুর (hymn of ignorance) ধরা দিচ্ছে। তাঁর গান অন্য মোড় নিচ্ছে, অন্য সুর ধরছে, অন্য তানে সাড়া দিচ্ছে—তার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে এই অদ্ভুত প্রহেলিকাময় জগতে কাম-কামনা দুঃখ-বেদনা (the birth and joy and passion of the mystic world রবীন্দ্র কাব্যে বারে বারে এই স্তরের সুর শুনেছি। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যেও এর ছবি পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু কবি শ্রীঅরবিন্দ যোগী শ্রীঅরবিন্দ হয়ে আরো ঊর্ধ্বের কল্পনা করছেন এবং কাব্যে তাকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভাষা, ছন্দ, কবির আবেগের কাছে হার মেনে যাচ্ছে।

সাবিত্রী কাব্যের ছন্দের কথা পূর্বেই বলেছি। তার উপমাও অনেক সময়ে সাধারণের বাইরে —সেইজন্য হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দুর্বোধ্য মনে হয়,

এখানে কবি, স্থপতিবিদ্, ইঞ্জিনিয়ার, গণিতজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞদের নিয়ে কবিতায় জুড়েছিলেন—একে গুরুচণ্ডালী না বলি, সাধারণের মনে একটা কষ্ট-কল্পিত উপমাই মনে হবে, অথচ প্রয়োগনৈপুণ্যে এগুলো মিলিয়ে গেছে তাঁর কাব্যে। আবার দেখি তিনি উপমা দিচ্ছেন—

High architects of possibility
And engineers of impossible,

Mathematicians of the infinitudes
And theoricians of unknowable truths.
They formulate enigma's postulates
And join the unknown to the apparent worlds.

They clamped to syllogisms of finite thought
The free logic of an infinite consciousness,
Grammared the hidden rhythms of Nature's dance
Critiqued the plot of the drama of the worlds
Made figure and number a key to all that is
The psycho analysis of cosmic self

* * * *

The unknown pathology of the unique
Assessed was the system of the probable
The hazard of fleeing possibilities,
To account for the Actual's unaccountable Sum
Necessity's logarithmic table drawn

* * * *

Derived the Calculus of Destiny

* * * *

Zigzagged at the gesture of a chess-player Will
Across the chequer-board of Cosmic Fate
Mathematised omnipotence, accountant mind.

এইরকম বহু উপমা 'সাবিত্রী' থেকে সংগ্রহ করা যায়, যা বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে বাধা নেই, কিন্তু প্রথম ধাক্কায় যে কোন সমালোচক বলবেন যে কষ্টকল্পিত। এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে ভাবের কাছে ভাষা পরাজিত, তাই জানা-অজানা যত কিছু উপমা আছে ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে গ্রথিত হচ্ছে—এখানে অঙ্কের সমাপ্তি হয়, কিন্তু নাট্যের অবসান নেই, কারণ এখানে যে নাটক লেখা হচ্ছে সেটা

Cast into a scheme the triple act of the One.
সেই One বা একই যে বহু, তার রূপ বহু, তার বিস্তার অনন্ত, তার গুণ অসীম, যোগে বিয়োগে তিনি অনাদ্যন্তবান্, —তাই উপমা, ছন্দ, সব হার মানে। এখানে দোষ কাব্যের নয়, কবির—তিনি যে রাজ্যের কথা বলছেন, যার গান শোনাতে চাইছেন, যার বাণী ভাষায় ধরতে যাচ্ছেন তার পরিচয় শুধু আমাদের নেই তা নয়—তার উপযুক্ত ভাষাও নেই—তাই প্রতীক (Symbol) দিয়ে বোঝাতে হয়—এখানে তাই তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—বহুকথন দোষ আছে অর্থাৎ drastic economy of word and phrase নেই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কবি লিখে চলেছেন শুধু মনের আনন্দে নয়, জীবনের 'মিশন' রূপেও। এই বিরাট কাব্যের সঙ্গে তাঁর জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—তিনি নিজে বদলেছেন, কাব্য বদলেছে। শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে শ্রীমার আসবার পূর্বেই এই কাব্যের পত্তন—তখন ছিল প্রথমভাগে এই তপ্ত ধরিত্রীর কথা—আর দ্বিতীয় ভাগে তার পরের কথা—Earth and Beyond. কবি বলেছেন—The poem was originally written from a lower level.........In the new form it will be a sort of poetic philosophy of the Spirit and of Life much profounder in its substance and vaster in its scope than was intended in the original poem.

যদিও শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে, প্রথমে এই কাব্য চেতনার নিম্নস্তর থেকে লেখা হয়েছিল তবুও সেটা সাধারণ পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট উচ্চস্তর—তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই সব দার্শনিক কাব্যে 'much variation of tone' থাকতে বাধ্য—এবং এগুলির প্রয়োজন আছে কাব্যকে সামগ্রিক ও সমৃদ্ধ রূপ দিতে (for the richness and completeness of the treatment)।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের মতে "Savitri......is niether subjective fartasy nor yet mere philosophical thought but vision aud revealation of the actual inner structure of the inner cosmos and of the pilgrim of life within its sphere."

সাবিত্রী মনোজগতের রূপ-বিচিত্রা বা কাব্যে দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাও নয়—সাবিত্রী আত্মোপলব্ধির সমগ্র চিত্র যা প্রত্যেক জীবন তীর্থ যাত্রীর অন্তর্নিহিত গঠনশৈলীর বিচিত্র চলচ্ছবি।

শ্রীঅরবিন্দের কথায়

He is the explorer and mariner
On a secret ocean without bourne

তিনি হচ্ছেন আবিষ্কারক ও নাবিক যে চলেছে এক বিরাট অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে।

তাঁর সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মৃত্যুর মৃত্যু অর্থাৎ অজ্ঞানের মৃত্যু কি ভাবে হয়, কোন সাধনায়।

পঞ্চম উল্লাস

রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

কোথায় আলো, কোথায় আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো—এই ত মানুষের কান্না, ভূমার জন্য, প্রেমের জন্য, আলোর জন্য কান্না। কিন্তু কাব্য শুধু জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস বা প্রকাশ নয়, flux of lifeই নয়, চঞ্চলা নদীর মত সৃজনশীল বিবর্তনও (creative evolution)। কবিতার মাধ্যমে কল্পনাশ্রয়ী মন শুধু বাইরের জগতকেই মনের লীলার সঙ্গে গ্রথিত করছে না, তাকে পদে পদে রূপায়িত করে, বৈচিত্র্যময় করে, সঞ্জীবিত উদ্দীপিত করে অর্থই বুঝিয়ে দিচ্ছে না—সে একটা গভীরতর অসন্তুষ্টির সুরও বহন করে নিয়ে চলেছে—হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনো খানে—এই অতৃপ্তির ধারা শুধু কামিনীর জন্য নয়, কাঞ্চনের জন্য নয়, ভোগের বস্তুর অভাবের জন্য নয়, এ কান্না—আইনস্টাইনের ভাষায়—Inner Harmony বা আন্তর সৌষম্যের জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাকেই বললেন ভূমার জন্য কান্না। মহাপ্রভুর কথায় বলা যেতে পারে

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—

দেখা, দাও, দেখা দাও, ধন নয়, মান নয়, কামিনী নয়, কাঞ্চন নয়। শ্রীঅরবিন্দ এর মূল রহস্যে গেলেন—কেন এই কান্না—because a subtler and vaster life is in birth—যে সূক্ষ্ম বিরাট জীবন জন্ম নিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে তারই প্রসববেদনা—হে মহাজীবন লইনু শরণ লইনু শরণ। There are deeper and more significant things to be said than have yet been spoken—মনের মধ্যে অনেক কিছু না-বলা কথা জমা রয়েছে, তাকে প্রকাশ করতে হবে চিন্তার ধারায়, সমষ্টিগত সাধনায়। কাব্যই যে তার প্রকাশ—

poetry, the highest essence of speech must find a fitting voice for them। কাব্যের এই স্তর শুধু কতকগুলি কথার সমষ্টি নয় বা ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ নয়, বা রচনাশিল্পীর বৈচিত্র্যই নয়, ভাবে ভাষায় ঝংকারে ধ্বনিতে বর্ণবৈচিত্র্যে, উপমায়, গভীরতম রহস্যে তথ্য ও তত্ত্বের সমবায়ে একটি আন্তর অনুভূতির চিত্র। আপনার আমার কাছে হয়তো মনে হবে এ আবার কাব্য কী। কিন্তু চির-কালের মানুষের সাধনা আলোর সাধনা—তমসঃ পরস্তাৎ জ্যোতিষাং জ্যোতি। মহাযোগীর অনুভূতিতে সাবিত্রীর রূপকে অপূর্ব কল্পনাশ্রয়ী হয়ে ফুটে উঠলো যোগের মূল ছন্দ, কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে। মৃত্যু হলো অমৃত, কালো হলো আলো, মহানিশাময়ী জেগে উঠলেন—

রসাতলমুখী জড় জগতের পর্বতদলে আলোড়ি দাও
অতলান্তিক গহ্বর তলে নবসৃষ্টির শিখা জ্বালাও

'All language is symbolic—বললেন Lascelles Abercrombie। বেদে, বাইবেলে, পুরাণে, এই ধরনের প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীযুক্ত পুরাণী তাঁর 'Savitri—An Approach and A Study' পুস্তকে শ্রযুক্ত H. w. Garrod এই মত উদ্ধৃত করেছেন (Once upon a time, the world was fresh, to speak was to be a poet, to name objects an inspiration ; and metaphor dropped from the inventive mouths like some natural exudation of the vivified senses.)
একদা এই পৃথিবী যখন নবীন ও সতেজ ছিল, তখন কথা বলাই ছিল কবি হওয়া, নামকরণ করার মধ্যেই ছিল অনুপ্রেরণা এবং মানুষের উদ্ভাবনী মুখ থেকে যে সহজ উপমা বেরুতো তাই হতো তার উজ্জীবন্ত ইন্দ্রিয়ের সহজ প্রকাশ। তাই মানুষ বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে বিচার করবার আগেই মন দিয়ে বুঝতো, গ্রহণ করতো।

শ্রীঅরবিন্দ ঋগ্বেদের সিম্বলিক ব্যাখ্যা করেছেন একথা পূর্বে বলেছি। ফ্রান্সিস টমসনের The Hound of Heaven আমাদের বেদের সরমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইয়েটস্ ও AEর বহু কবিতাই কাব্যের

মাধ্যমে এক রহস্যালোকের বার্তা আনে। ইয়েটসের মতে কাব্যের জগৎ হচ্ছে এক তন্দ্রাময় জগৎ, কাব্য তারই অনুলিপি (record of a state of trance), তাকে ঠিকমত ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা দিয়ে রূপ দিতে হয়—। ভ্যালেরি, ব্যদলেয়র, মালার্মে, ভারলেন সিম্বলিক কবি বলে বিখ্যাত। জর্জ স্টিফান ও আলেকজাণ্ডার ব্লকও এই দলের। আদর্শ সৌন্দর্য ও আদর্শ প্রেম নিয়েই এঁরা ব্যস্ত। কিন্তু ইয়েটসের মধ্যে আমরা দেখেছি সেই দ্বন্দ্ব তাঁরই ভাষায় between self and soul. কিন্তু এখানে অপর কোন অনুভূতি নেই, তাঁর অতীন্দ্রিয়তা আধ্যাত্মিকতায় পৌছয় নি। এই সব কবির কাব্যে আমরা পাই একটা "increased awareness" কিন্তু তারা পৃথিবীরই কবি, তার সুখ-দুঃখের কামকামনার। আরো আধুনিক কবি Day Lewis এর Magnetic Mountain-এর কথা পূর্বেই বলেছি। Stephen Spender-এর বহু কবিতাকেও Symbolic না বললেও অনুভূতিময় বলা চলে, যেমন A Trance—কবি ও কবিপ্রিয়া শুয়েছেন—একজন জেগে, একজন ঘুমিয়ে—নিদ্রাতুরা প্রেয়সী শ্লথ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বিছানায় সরে গেছেন—প্রিয় চেয়ে আছেন ঘুমন্ত প্রিয়ার দিকে—সুষুপ্তির জগৎ থেকে যে সব ভাব আসছে তা প্রতিফলিত হচ্ছে তার মুখে চোখে—ঘুমন্ত সে কেঁদে উঠছে, ককিয়ে উঠছে—আশ্রয় চাইচে—কবির মনে দুঃখ যে প্রিয়তমার কষ্টের ভাগ তিনি নিতে পারছেন না।

I watch that precipice of fear
She treads among her naked distresses

তাই কবির সত্যানুভূতি হয়

To that deep we are committed
Beneath the forests of our flesh
And shuddering scenery of these dreams,
Where unmasked agony is permitted
And bones are bared of flesh that seems ;
Our hands unravelling beauty's mesh,
Meet our real selves ; our charms outwitted.

কবির কাব্যে আমরা নতুন জগতের সন্ধান পেলাম।—তাই হারবার্ট রিড়ের মত আজকের কবিও বলতে আরম্ভ করেছেন

Yesterday, tomorrow and today
Are in my single glance.

তাঁর 'Mutations of the Phoenix "পুরাণীর মতে "openly symbolic. বিখ্যাত জার্মান্ কবি রেইনার মারিয়া রিল্কের কথাই ধরা যাক্—তাঁর Elegies ওSonnets to Orpheus সমধিক খ্যাত। কবির পরিচিতা এক বান্ধবীর কন্যার অকাল মৃত্যুকে অবলম্বন করেই কবির মনে যে গভীর সুর বেজে উঠলো তাকে symbolic বলাই চলে। এই মেয়েটি নাচতো চমৎকার, তার মধ্যে ছিল জীবনের প্রকাশকে রূপ দেবার একটা প্রচণ্ড চেষ্টা—সে অসুস্থ হলো—একদিন সে তার মাকে বললে যে সে নাচতে পারবে না—তার শরীর ভারী ও মেদবহুল হয়ে আসছে—কিন্তু তার জীবনীশক্তি ছিল অদ্ভুত—সে ধরলে গান—কণ্ঠে সুরও একদিন নিভে এলো—সে ধরলে আঁকা—মায়ের চিঠিতে কবি এই কাহিনী পড়ে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে এই প্রতীককে ঘিরে তাঁর কাব্যলক্ষ্মী ঝংকার দিয়ে উঠলো, Sonnets to Orpheus"এ এবং এই প্রতীকের মধ্য দিয়েই কাব্যে প্রকাশ পেলো সাধারণ দৃষ্টির বাইরের কতকগুলি অনুভূতি, যাকে বলা হয়েছে সমালোচকের ভাষায়—This conception of existence is a wider orbit including both life and death necessitated (or implied) a revaluation of all experience, and particularly of love. বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটাই কবির কাছে বেড়ে গেলো—কবির অন্তর্দৃষ্টিতে প্রথম কবিতাতেই তিনি দেখলেন

A tree ascending there. O pure transcension
O Orpheus sings ! O tall tree in the ear !
All noise suspended, yet in that suspension
What new beginning, beckoning, change, appear

বনস্পতি উর্ধ্বে উঠছে—অর্ফিউস—জীবন ও মৃত্যুরে যিনি সংযুক্ত করেন—তিনি গান ধরেছেন—সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে আছে—তারই মধ্যে নূতনের আরম্ভ—নূতনের ডাক—নূতনের সুরে রূপান্তর। কবি শ্রীযুক্ত হারীণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত পাঞ্জাবের বিখ্যাত কবি ভাই বীর সিংহের 'বনস্পতি' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কবি রিল্কে মৃত্যুকে রূপান্তর বলেই গ্রহণ করলেন না, রসান্তরও বটে।

Be, in this immeasurable night,
At your senses' crossways magic cunning,
Be the sense of their mysterious tryst
And should earthliness forget you quite,
Murmur to the quiet earth. I am running.
Tell the running water: I exist.

এই রূপান্তরিত অয়মহং ভোঃ-র গানই কবি গেয়েছেন। তাই তাঁর শেষ কবিতাগুলির একটিতে (Soul in Space) তিনি বললেন—

Here I am, here I am, wrested reeling.
Can I dare? Can I plunge?
But now,
Who'd be impressed if I said
I am the soul?

* * *

Secret no more;

কবি রিল্কের কাছে জীবনের সব কিছু অনুভূতিই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন "for what he called 'transformation' as a fuel or charge for some tremendous rocket into unknown space."" একটা গভীর আবেগ না এলে মানুষ তার চিহ্নিত সীমানা ছেড়ে যেতে পারে না—সেইজন্য তাঁর কাছে ত্যাগ বা

ভোগ (Renunciation and fulfilment) দুই-ই এক্। হওয়াই (Being) হচ্ছে আসল। শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্র কাব্য ও সাধনারও মূলে এই কথা। সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যেই এই গণ্ডীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে নূতন রূপ নেবার যে প্রাকৃতিক রহস্য তাকেই বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক নাম দিলেন ক্রমাভিব্যক্তি বা এভলিউশন—এই যে বিস্তার, এই যে বিক্ষেপ, প্রকৃতির মধ্যে এই যে চিরন্তন আলোড়ন, একে খণ্ড খণ্ড করে দেখাই আমাদের স্বভাব। জুলিয়ান হাক্সলী বলেন, অভিব্যক্তির নানা রূপগুলি কালে স্থির হয়ে আসে (eventually reach their limits and becomes stabilshed)। মানুষই একমাত্র জীব যে এই অভিব্যক্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার প্রথম জয়লাভ যখন সে কথা কইতে পারলে, বলতে পারলে, জানাতে পারালে, এবং পরে লিখে রেখে যেতে পারলে তার চিন্তার ধারাগুলিকে। সেইখানে তার দ্বিতীয় জয়লাভ—ক্রো ম্যাগনন মানুষ যখন 'survival value' কিছু দিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। সে গুহাগুম্ফার গাত্রে আঁচড় কাটতে আরম্ভ করলে, সে তার কুঠারকে চিত্রবিচিত্র করতে শিখলে, সে আকাশের দিকে চেয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সত্যকে জানতে চেষ্টা করলে। আজ তাই মনীষীদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে "Is it possible that humanity is on the eve of yet another breakthrough on to a higher level, brought about this time by his own inner efforts and not by outer circumstances? মানবজাতির ও সভ্যতার আর-একটা গণ্ডি পার হবার সময় এসেছে না কি?

এর জবাব দিলেন Lowes Dickinson (A Modern Symposium)—"Man is in the making but henceforth he must make himself. To that point Nature has led him out of the primeval shine. She has given him limbs, she has given him a brain, she has given him the rudiments of a soul. Now it is for him to make or mar that splendid torso. Let him no more look to her for aid, for it is her will to create one who has the power to create himself." (Quoted

by Kenneth Walker in his book on 'A study of Gurdjieff's Teaching)

এই উত্তর মনীষীর ও বৈজ্ঞানিকের—সাধকের নয়—কিন্তু সাধক বলতে আমরা ত একটি বিশিষ্ট অদ্ভুত কল্পনাশ্রয়ী জীবকে ধারণা করি না—সাধক হচেছন তিনি যিনি যে রকম ভাবেই হোক সত্যকে জানতে চেয়েছেন, ঋতকে বুঝতে চেয়েছেন—সে খণ্ড ভাবেই হোক্ অখণ্ড ভাবেই হোক্—বৈজ্ঞানিকও সাধক, কবিও তপস্বী, তাঁদের দৃষ্টিও সত্য-দৃষ্টি। যজুর্বেদে আছে—আমি উঠেছি. ভূ থেকে ভুবে, তার পরে গেছি স্বর্গে, সেখান থেকে আমি যাব সবিতার জ্যোতির্ময় লোকে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—এই তো উর্ধ্বগতি—আমার দেহ এই মাটির জড়ের উপাদান নিয়ে (Matter)—তাই থেকেই আমি উঠি প্রাণময় রাজ্যে (life),, সেখান থেকে উঠি মনোময় রাজ্যে (Mind). কবির দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কাছেও এই সত্যের একটা অপূর্ব দিক প্রতিভাত হয়েছিল। "জীবনে যেটা চরম তাৎপর্য সেটা তার নিহিতার্থ যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ থেকে রূপ নিচেচ, তাকে বুঝতে পারছি সে প্রাণানাং প্রাণং, সে প্রাণের অন্তরতর প্রাণ। এই গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্ নিগূঢ়কে নাম দেওয়া যায়না, শুধু বলা যায় যে এই তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া। এ কেবল ব্যক্তিগত শ্রেণীগত পরিচয়কে ভজন করবার স্বভাব নয়, সেই পরিচয়কে নিরন্তর অভিব্যক্ত করবার স্বভাব"। এই মনোময় রাজ্যের শেষ কথাই হলো অতিমানস। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি উপনিষদের ভৃগু বারুণি সংবাদ। বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু বললেন—পিতা, আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন, ব্রহ্ম অর্থে কোন হস্তপদবিশিষ্ট দেবতার কথা নয়, সর্বম্‌গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্ যে রহস্য তারি অনুসন্ধান। ভৃগু বসলেন তপস্যায়—দিনের পর দিন যায়, রাত্রির পর রাত্রি—চোখের উপর ফুটে উঠে—অন্নময়ী এই পৃথিবী, শস্যমালিনী এই বসুন্ধরা রূপরসগন্ধ-স্পর্শ নিয়ে শ্যামকান্তিময়ী—এতো মিথ্যা নয়, অন্নই ব্রহ্ম—অন্নেই সব বাঁচিয়ে রেখেছে—এই জড়ের দেহে প্রতিটি অণুতে রয়েছে সেই অন্নময় বীর্যের মহাশক্তি অবরুদ্ধ। সত্যের একটি পর্দা উঠে গেলো। জড়ের রহস্যের পিছনে আছে প্রাণের রহস্য—জড় ত প্রাণের কঞ্চুক। ভৃগু আবার বসলেন তপস্যায়—স তপোহতপ্যত—প্রাণো ব্রহ্ম, যে প্রাণ এজতি, দুলছে, কাঁপছে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্মীভূত যে প্রাণ, Elan

Vital. আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হয়তো এইখানেই থামবেন, দেখবেন সেই প্রাণের স্পন্দনকে, ছন্দকে, নিয়মকে। কবির ভাষায় বলা যায়—একদিকে 'আমার আমি আর একদিকে তোমার তুমি' এই মিলিয়েই চলেছে বিশ্বলীলা—একদিকে সেই মানুষী তনুমাশ্রিতম আমি আর একদিকে ঘোররাবা মহাতামসী প্রকৃতি, এরই মধ্যে ভাঙচে, গড়ছে স্থষ্টির প্রবাহ, গড়ে উঠছে ঘটনার পুঞ্জ, আর থেকে যাচেচ নিত্য চক্রের আবর্তনে স্থষ্টিশীল বীজে অমর একটি সত্তা, "The creative and impenshable individuality, inner harmony". (Einstein)

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের সম্যক্ বিচারে তাঁর পরিণতিবাদের মূল্য আছে। যে সত্তা নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যাষ্টির মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে, অণুতে রেণুতে তিনিই আজ নিজেকে গুটিয়ে নিচেচন কোটীতে— Return of the spirit to itself. যোগ হচেচ সেই অবতরণ-উত্তরণের, আত্মউন্মীলন-আত্ম সমর্পণের পন্থা—একত্রীকরণ বা integration. সাবিত্রীতে তার প্রকাশ দেখি।

———

ষষ্ঠ উল্লাস

It was the hour before the Gods awake. ভোরের আগের যে প্রহরে স্তব্ধ অন্ধকারের পরে যখন নিঃসীম তামসতীর্থে মহাচ্ছন্ন দিগ্বিদিক্—মহাপ্রকৃতির অতি প্রাথমিক অবস্থার সেই ছবি অপূর্ব কবিকল্পনার সঙ্গে সাধনালব্ধ দৃষ্টির সঙ্গে মিশে সাবিত্রী মহাকাব্যের সূচনা করলে। কেউ জাগেনি, এমন কি, প্রজাপতি বিশ্বপালরাও নন্। শুধু সেই মহাতামসী কালো রাত্রির মতো শুয়ে নৈঃশব্দের মহাসাগরে, স্পন্দনহীন সীমাবিহীনে—কবির ভাষা হলো—

Lay stretched immobile upon silence's marge.

এই তামসীর মধ্যেই সব সম্ভাবনা নিহিত—তাঁরই গর্ভে আছে আলো—আঁধারবরণীই হবেন কনকোজ্জ্বলবরণী। মহানিশায়, অতিনিশায় এই মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরা কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী নবীন-নীরদবরণা নামেন সাধকের মনে আলোর প্রথম রেখাটি নিয়ে, অরূপ রাশির মধ্যে তাঁর রূপ চমকায়—এই রকম একটা প্রতীকের সাহায্যেই আমরা যুগে যুগে বুঝতে চেষ্টা করেছি এই অপূর্ব অবতরণের ছন্দকে, মহাকালের সীমানা ডিঙিয়ে যে পরাশক্তি নিত্যলীলায় নিমগ্না।

ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ

তাঁর বিকাশ, প্রকাশের কথা ধ্যান করলে জড়বুদ্ধির লোকও যে কবি হয়ে যায়। আলো আসছে, আলোর দেবতা আসছেন,—

সাবিত্রী জেগেছেন—যিনি কালাতীতা, ত্রিকালিনী তিনিই কালের বন্ধন মেনে নিচ্ছেন, সীমিত করে নিচ্ছেন নিজেকে, সংহত করছেন সিন্ধুকে বিন্দুতে। ফিরে তাকালেন তিনি—এ যেন সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক্। কত রূপ, কত রং, কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত অতীত, কত বর্তমান, কত ভবিষ্যৎ, কত ভাঙা, কত গড়া—আমাদের শাস্ত্রে মাতৃরূপকে কল্পনা করেছি সর্বেশে-সর্বাধিষ্ঠাত্রী রূপে। অধিভূত, অধিদৈব অধিযজ্ঞ সর্বভূমিতেই তাঁর বিচরণ, তাঁর ব্যাপ্তি। ভোগ যোগ মোক্ষ তাঁরই মধ্যে।

ঋক্ সাম যজু অর্থাৎ উত্তান, প্রাণ ও দান তারই—তাই লয়ও তাঁর মধ্যে, আলয়ও তাঁর মধ্যে। তাইতো মহালয়া তিনি—

স্বষ্টি স্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি

Her witness spirit stood reviewing Time.
কালস্রোত ভেসে আসছে—চঞ্চলা নদীর তরঙ্গভঙ্গের মতো। কত ঢেউ উঠছে, কত ঘটনা ঘটছে—সাক্ষীর মতো তিনি দেখছেন—অথচ প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত তিনি। নিজের জীবনের সঙ্গে মেশানো সেই ছবি। সে তো শুধু পটে আঁকা ছবি নয়, সূর্যদীপ্ত পরমের পথও, যোগাদ্যানও। তিনি যেন দেখছেন তাঁর শৈশবের ক্রীড়াময় দিনগুলিকে, বয়ঃসন্ধির নীলাঞ্জন সমপ্রভ দ্যুতিময় যৌবনকে, প্রেমের অরুণার্কস্নিগ্ধ ক্ষণগুলিকে—ঝুলছে নিয়তির খড়্গ—দেবর্ষি নারদ বলে গেছেন তাঁর প্রিয় পুরুষের আয়ুমাত্র তিনশ পঁয়ষট্টি দিন—বারোটি প্রেমমুগ্ধ মাস—তারপর বিদ্যুদ্‌গতিতে নেমে আসবে শাণিত তরবার, তারই দোসর, তারই সহচর মিলিয়ে যাবে বিলুপ্তির মহাসমাধিতে। এ হচ্ছে বিশ্ববিধানের অমোঘ নিয়ম। জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা ভবে। সাবিত্রীর মনে এই অভীপ্সা জাগালো যে, তিনিই এই নিগড়কে ভাঙবেন। অশ্বপতির যোগ ঊর্ধ্বে উঠে এই মহাশক্তিকে নামিয়ে এনেছিল বিশ্বমানবের আর্তি হরণের জন্য—

One shall descend and break the iron law.

এ সমস্যা বিশ্বসমস্যা—আবার এ সমস্যা প্রেমের সমস্যা—সে প্রেম মানুষী দেহগত আত্মেন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা শুধু নয়, কৃষ্ণেন্দ্রিয় সর্বগ্রাসী প্রীতি ইচ্ছা তো বটেই এবং দুই মিলিয়ে এক অপরূপ মহা আলোড়নের অনুভূতি, যাতে করে মনে হয়, সমস্ত বিশ্ব বুঝি স্থান পেতে পারে তাঁর বুকের মাঝে।

The whole world could take refuge in her single heart.

যেন সেখানে সমস্ত আকাশ ভরে তার হৃদয়ের উদারতা, সমস্ত সাগর ব্যেপে তার মহা কল্লোল—

A magnanimity o Sea or Sky.

আজ সেইদিন এসেছে—বিধিনির্দিষ্ট পরমলগন্। গরবিনী হেলা করবেন না—তিনি যে বীর্যবতী, শক্তিমতী, মধুমতী, প্রগলভা নায়িকা শুধু নন্—ধীরা সাধিকা। প্রাণের অন্নময় জ্ঞান, প্রাণ ও দান তারই মধ্যে লীন। এই তো তাঁর ত্রিগুণাত্মিকা চিন্ময়ী রূপ, এই তার বিলাস ও বিকাশ তার মাধুর্য, ও ঐশ্বর্য তার ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি।

ভূমি থেকে যে বিদায় নিলে তাকে যমের অর্থাৎ কালের নিয়মচক্র থেকে পুনরায় ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞানের মধুময় ভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার যে ব্রত তাইতো সাবিত্রীর ব্রত। কারণ তিনিই তো একমাত্র সতী—অর্থাৎ আছেন, সৎ-ইয়ং; এক হাতে তাঁর কৃপাণ আর এক হাতে বরাভয়—মৃত্যুর খোলসকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে, সেই মুখোশ পরা পরা নাস্তিত্বটাকে আস্তিক্যবুদ্ধিতে পরাস্ত করতে হবে, অমৃত যাত্রাপথের যত কিছু বাধা সব দূর করতে হবে—আঘাতে আঘাত করে ভাঙতে হবে কারাকে—আত্মার শক্তি দিয়ে, জ্ঞানের দীপ্তি দিয়ে, প্রেমের মুক্তি দিয়ে—তাইত কবি বললেন:

She must disrupt, dislodge by her soul's force
a block on the immortal's road.

এ যুদ্ধ, এ বেদনা পৃথিবীর জন্য, জগদ্ধিতায়—তা না হলে কী দরকার স্বেচ্ছায় এই সীমার আবরণ গ্রহণ করার, প্রেমের বন্ধন স্বীকার করার। মরজীবনের সীমানায় আসা মানেই মৃত্যুর অধিকার স্বীকার করা। কিন্তু মরতার শ্মশানে বসেই অমরতার সাধন করতে হয়—সাধকের আসন তাইত শবাসন; পরম শিব সেই আসনেই জেগে বসেন—অকালে অল্প সাধনায় শক্তিলোভে নিছক রূপ-ব্যাহৃতিতে তাঁকে জাগালে সুরাপান মত্ত প্রমত্ত ভৈরবই হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, তাঁর সর্বাস্তিবাদের তুরীয় সর্বময় মহিম্ন যে রূপ, যা অতলান্তিক গহ্বর তলেও নবসৃষ্টির শিখা জ্বালায়, তারা দীপালিকা জেলে দেয়—তার পূর্ণ সাক্ষাৎ মেলে না। দেখতে পাই না তাঁকে যিনি পরমপাবন

কেবলং ভাসকং ভাসকানাং
তুরীয়ং তমঃ! পারমাদ্যন্তহীনং

সাবিত্রী জাগলেন—তাঁর দৃষ্টি, তাঁর হাসি পৃথ্বীসত্তাতে ছড়িয়ে দিলে স্বর্গের দ্যুতি—ভূমি পুত্রীর সাজ গ্রহণ করেও স্বর্গের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক। এই জাগতিক ভার (human load) তুলে নেবার জন্যই তাঁর অবতরণ, তাঁর আগমন, তাঁর জাগরণ, তাঁর সাধনা, তাঁর তপস্যা, তাঁর ব্রত। মৃত্যুকে শুধু জয় নয়, বিনাশের বীজটিকে পর্যন্ত অমৃতত্বে পরিণত করতে হবে—মৃত্যু থাকবে না—নাস্তিত্ববোধ থাকবে না,—সবকিছু 'না' নেতিত্ব মিশে যাবে পরম ইতিত্বে—এইখানে, এই দেহে, এই আধারে, এই বিগ্রহে; শুধু রাধার মহিমা প্রেমরসসীমায় নয়, আলিঙ্গিত শিবশক্তির মতো নয়, প্রজ্ঞা—বজ্রধরের মতো নয়, শবরের বক্ষে ডোম্বী আদরিণী নৈরামণির মতো নয়, এই মৃন্ময়-চিন্ময় ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে এক সম্পূর্ণ সচেতন সমশক্তিতে বিকশিত, সমভাবে বিভাসিত, সমগুণে উদ্ভাসিত অর্ধনারীশ্বর রূপে। আর এক সাধক কবি শিব-শিবানীকে দুলতে দেখেছিলেন এবং দিব্য দৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন—

ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

শ্রীঅরবিন্দের কাছে, এই ধূর্জটি শুধু স্থাণু নন, অচল নন্, ধীর শিব নন, পশুপতি নন্, পাশ ছেদনকারী কুলীশ নন, তিনি সাধ ও সাধ্যের আত্ম-সমাহিত মূর্ত বিকাশ। সে পার্বতী শুধুই শক্তিমতী নন্—তিনি মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহাদেবী, তিনি মহেশ্বরী দিব্যশক্তির Divine dynamics, যে সমগ্র রূপ তারই দুই বিভিন্ন প্রকাশ এই শিবশক্তি পুরুষ প্রকৃতি কিন্তু সমগুণ সম্পন্ন মিলিত সক্রিয় উদ্ভাস।

কালের খেলাতে সত্যবান হলেন দাবার ঘুঁটি (In the chess-play of Earth-soul with doom)। কর্মের নিয়মে এক দিকে দুঃখ জরা অতৃপ্তির দাবাগ্নি, আর এক দিকে দিব্যের অনুভূতিতে হ্লাদ, আনন্দ। এই দুই এর মাঝে বসে আছেন কায়াহীন নেতিত্ব (Disembodied Naught)। মৃত্যুকে নেতিত্বকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে যে চিরন্তন হাঁ (Everlasting Yes)কে অঙ্গীকার করা। পৃথ্বী-সত্তা বারে বারে বেদনার কশাঘাত (pain with its lash) খাচ্ছে, অজ্ঞানের বিরাট অতলে ডুবে যাচ্ছে, আবার আর একদিকে সে পাচ্ছে দিব্যের আনন্দ, মধুর বিধুর আস্বাদন, রজতশুভ্র ধারায় ঝরে ঝরে পড়ছে সেই অমৃতধারা। জীবনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতকে রোধ করে দাঁড়াবে মৃত্যু—এই দৃপ্তদীপ্ত প্রাণ-পৃষ্ঠাকে বন্ধ করতে দেওয়া হবে না—এই হল সাবিত্রীর রূপ। উপমার পর উপমা দিয়ে কবি শ্রীঅরবিন্দ এই লক্ষ্যটিকে

বোঝাতে চাইলেন—যে দেওয়া নেওয়া, পাশব সাম্যের কাঁচাদলিলে সাক্ষর নয়—তার জন্য দরকার সেই ঐ আলোকিত পৃষ্ঠাকে বন্ধ করা

Close the luminous page—set a signature of weak assent to the brute balance of the world's exchange) সেক্সপীয়রের মতো কবি শ্রীঅরবিন্দ প্রশ্ন করছেন সাবিত্রীর মাধ্যমে—

Whether to bear with ignorance and death
or hew the ways of immortality
To win or lose the god-like game for man
Was her soul's issue thrown with destiny's dice.

একদিকে অজ্ঞান, মৃত্যু, আর একদিকে অমৃতের পথনন্থন।

এই হারজিতের পাশাখেলায় মানুষ জিতবে না তলিয়ে যাবে। না, না মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছে—বড় আমির যে সত্তা তারই জয় হবে।

এ যেন আর এক কবির কথায়—

হবে জয় হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী
তোমার মহিমা আমি সফল করিব রাণী

তাই সত্যবানের মৃত্যুদিনে সাবিত্রী জাগলেন এবং সেই জাগরণ পূর্ণাভিষিক্ত শক্তির—পরা ও অপরা শক্তির, মহাভাবের, অনয়ারাধিতো রাধার। মহাকালী জাগলে তবে মহাকাল জাগেন, তখনই বিধির বিধান উল্টে যায়, চেতনার কালের সীমা ভেঙে যায়। আর সেই জাগার সঙ্গে মানুষও বলে—

ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমোই
যোগে যাগে জেগে আছি
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' সম্বন্ধে বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে 'সাবিত্রী' সাধারণ শ্রেণীর কাব্য নয়, প্রচলিত সংজ্ঞায় যাকে আমরা মহাকাব্য বা 'এপিক' বলি তাও নয়। এর ভাব, এর ভাষা, এর উপমা, এর বাক্যসম্ভার, এর বর্ণবৈভব ও বিচিত্র মানস শুধু অন্তর্মুখী নয় চিন্তালব্ধ জ্ঞানলব্ধ, সাধনলব্ধ রূপকল্পের বিশিষ্ট প্রতিমূর্তি (Image) গড়ে চলেছে। বুদ্ধিকে উদ্দেশ করে কথার পর কথা সাজিয়ে একটু সুষ্ঠু বাক্যমালা গঠন করাই এর উদ্দেশ্য নয় (more than mere logical language addressed to the intellect) এ যেন কবি দেখছেন, কাব্যসৃষ্টি হচ্ছে আপনি (a vision by identity), এক ধরনের উচ্চকোটির দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, জীবন্ত ভাস্বর, বেদ উপনিষদের সমগোত্র।

সাবিত্রীর সাধনার উদ্দেশ্য আত্মদীপ্তি, তর্ক বিচার নয়—তাই কালো পেরিয়ে আলোর সাধনাই অমৃতের সাধনা। এই আলোকের ঝর্নাধারাতেই ডুবিয়ে নিতে হয় মনকে, নিবিড় আঁধার মাঝে তাঁরই অরূপরাশি চমকায়।

আমরা দেখেছি যে মহাভারতেরই একটি কাহিনীকে (Legend) সাধনার প্রতীক (Symbol) করে নিলেন কবি। পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছে এই মহাকাব্য। কতবার কেটেছেন, লিখেছেন, বদলেছেন। নীরদবরণের সান্ধ্যবৈঠকে বলেছিলেন যে বারো বার সংশোধন করেছেন প্রথম পর্ব—তাঁর সাধনার, অনুভূতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীরও বিবর্তন হয়েছে। সত্যবান, যিনি আত্মার প্রতীক তিনি মৃত্যুর আঁধার রাজ্যে নেমে এলেন, মরতার জোয়াল ঘাড়ে করলেন কেন? জগদ্ধিতায়। সাবিত্রী হলেন সেই পরমার প্রতিনিধি যে উদ্ধার করবে সত্যবানকে মৃত্যুর কবল থেকে। অশ্বপতি হচ্ছেন উর্ধ্বাশী মানুষ, প্রাণপুরুষ, মানবাত্মার প্রতীক, তপঃশক্তির প্রতিভূ—এর তপস্যার সীমা নেই, আকূতির শেষ নেই, এঁর আস্পৃহা অনন্ত—এঁর একমাত্র মন্ত্র, একমাত্র তন্ত্র হচ্ছে এগিয়ে চলা—অনুভূতির পর অনুভূতির রাজ্য পার হয়ে যতক্ষণ না সেই পরমের স্তরে পৌছানো যায়, বুদ্ধি মন অহংকার সবকিছু অতিক্রম করে, কিন্তু নাস্তিত্বে নয় অস্তিত্বের চরমে, মনের অতীত অধিভূমিতে, অতিমানসের ক্ষেত্রে। কিন্তু এ যাত্রা হবে তোমাতে আমাতে একত্তর—এবং এ যাত্রার শেষ নেই—এ তীর্থপরিক্রমারও অন্ত নেই। এখানে চাই তৃতীয় নয়ন, অশেষকে দেখা, অতন্দ্র মনে—

Exhaust--less seeings o the unsleeping mind
মহাযোগেশ্বর তখনি দেখান—পরমম্‌রূপমৈশ্বরম্‌
Revealed the grandeur of the Infinite

তারপর এই বোধিই আসে, প্রেমের আছে এক অখণ্ড রূপ, জীবনের ধারা যাতে বদলে যায়, নূতন যুগ সৃষ্টি হয়, নূতন সূর্য্যের উদয়:

To love, to love are signs of infinite things
Love is divine power by which all can chɩ nge
An hour began, the matrix of new time, a new age.

*　　*　　*　　*

When unity is one, strife is lost
And all is known and all is clasped by love
My love eternal sits enthroned in God's, calm
For love must soar beyond the very heaven
It must change its human ways to ways divine.

যখন সেই যোগ, সেই দৃষ্টি পূর্ণ হয়, সর্বগ্রাসী সর্বপ্লাবী হয় তখন তোমাতে আর আমাতে থাকেনা তো কোন বিভেদ, হয়না কোন বিতর্ক, অন্তর্যুদ্ধ বহির্যুদ্ধ আপনি যায় থেমে, কারণ তুমিই যে আমি, আমিই যে তুমি—প্রেম হচেছ্‌ সেই রসায়ন যা দুইকে করে এক, যা জীবকে করে শিব, শিবকে করে জীব—যা ওঠে নিজের আস্পৃহায়, জ্ঞানে, প্রেমে উর্ধ্বলোকে দেবতার স্বর্গে আর স্বর্গ নেমে আসে মাটিমায়ের কোলে। প্রতিটি মানুষ-মানুষীর মনে প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিটি ছন্দে, প্রতিক্ষণে এই যে মনে বনে বৃন্দাবনের রসাভাস এইতো নিত্যরাস। পৃথিবী আর স্বর্গ হয়ে যাবে এক, পূর্ণের পূর্ণাভিসিঞ্চনে মধুময়—পার্থিব ধূলিও মধুমান, স্বর্গের দেবতাও মধুময়—জরামৃত্যু বিনষ্টির অতীত এই লোকই দিব্যলোক—এই হলো রস নিরমাণ। সাবিত্রী-সত্যবানের প্রেমকে এই স্তরেই নিয়ে গেছেন কবি। এই 'প্রেমতরঙ্গে অবগাহি' সত্তার হয় শুধু রূপান্তর নয় কালান্তর, ভাবান্তর, তার বাইরের শ্রীরূপ উদ্ভাসিত হয় শত শিখায় স্বরূপের জ্যোতিতে।

তাই এই যুগ্ম জীবনের সব কিছুরই সার্থকতা আছে, কারণ মাটিতে আরম্ভ যে জীবন তার শেষ যে আকাশের ঐ উর্ধ্বলোকে

Our Earth starts from mud and ends in the sky.

এইতো পুরাণী প্রজ্ঞা, এই পরাশক্তির ক্রিয়া, এইতো মহাহ্লাদিনী মহামায়া। ই মহামেধা মহাস্মৃতিকে আমরা বারে বারে হারিয়ে ফেলি, ভুলে যাই আমরা সেই একমাত্র যিনি আছেন অর্থাৎ সতীর, আনন্দময়ীর, কনকোজ্জলবরণী সাবিত্রীর (অর্থাৎ বাক্ ও তেজের যিনি সমন্বয় করেন সত্যের ঋতের প্রদীপ্ততায়) সন্তান—এক কথায় মায়ের ছেলে। সাধে কী আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—আমার আমার করিসনে নরেন, 'আ' টা কেটে দে, বল্ মা'র। কিন্তু এই স্মৃতি যে মুছে গেছে, মহামেধা যে লুকিয়েছেন, কারণ

দিব্যের যে অবতরণ তপস্বীর জ্যোতির্মন্ত্রে নিত্য উচচারণ মৃত্যুশীল আঁধারে
পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্র তেজে—

পেলো না কায়া সবিতার সভাতলে সাবিত্রীর গান
মৃত্যুকীর্ণ মনে দিলনা ধরা সে অপরূপা
বিশ্ব পদ্মদলে স্তব্ধ হয়ে রয়ে গেল সুপ্ত বেদনা ভাবনা।

সপ্তম পর্বে দেখেছি—শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে যখন দিব্যবিরোধী শক্তিই পূজা লাভ করে (Worship was offered to the undivine) যখন হৃদয়ের সাধারণ মানবিক প্রকাশ পর্যন্ত বদ্ধ (Hearts' human law) তখন সবই তো অস্বাভাবিক—তখন এই স্তরের যে যাত্রী সে তো একা (lone discoverer)। তাকে যুদ্ধ করতে হয় অন্তশঃক্রদের সঙ্গে যারা তার আলো কেড়ে নিয়েছে (He wrestled with powers that snatched from mind its light.) অজগররাত্রির সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয় (grey python night)। বোরিস পাস্তারনিকের একটি কবিতায় এই অজগরের সঙ্গে যুদ্ধের প্রতীক প্রতিকৃতি পাওয়া যায়।

কিন্তু বৈরথই মানুষকে বাঁচিয়ে দেয়, জাগিয়ে দেয়, উল্লসিত করে, তার ত্রস্ততা ভীতি দূর করে, সে প্রকৃতির তরঙ্গাভিঘাতে তলিয়ে যায়না, একদৃষ্টে দেখে নেয়, তারপর নিজের সত্তাকে নগ্ন নরকের সঙ্গে মুখোমুখি করে দেয় বজ্রের আলোতে, তখনই দৃষ্টিগোচর হয় তামসী রাত্রির শক্তির

সঙ্গে, তার হৃদয়স্পন্দনের সঙ্গে, কালোকে না জানলে আলোকে জানা যায় না—

Then could he see the hidden heart of night.

দেখতে পায় আর যে এই ঘন কালোর পর্দা দুলছে নিজের অহমিকায়, কাঁপছে কামনায় বাসনায়, প্রভুত্বের চিন্তায়, শক্তির লোলুপতায়—বিরাট দেউল কিন্তু, কারে তুই খুঁজিস ওরে দেবতা নাই ঘরে—

Lives without a spirit within

কিন্তু শুধু কি তাই, কবির কল্পনা সেইখানেই থামলো না, তিনি অপূর্ব উপমা দিলেন:

As in a studio of creative death
The giant sons of darkness sit and plan
The drama of the Earth.

এখানে যে শক্তির আসন সে হচ্ছে নেতির দেবতা, কিন্তু তবু সে সৃষ্টিশীল, বিরাট তামসীর পুত্রেরা বসে আছেন সেখানে, পৃথিবীর নাটককে করছেন পরিচালনা। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—মনের বিবর্তনের যাত্রাপথে এই স্তর মাড়িয়ে যেতেই হবে সকলকে। যুধিষ্ঠিরের মত সকলেরই আছে নরকদর্শন—স্বর্গে যাবার ঐ পথ।

None can reach heaven who has not passed hell.

মহাযানসূত্রের কারণ্ডব্যূহে দেখি বলছেন মহাশ্রমণ—এবম্ ময়া শ্রুত, আমি শুনেছি ভগবান তথাগত একদিন জেতবনে বিহার করছিলেন, এমন সময় একটা দিব্যা পরমাজ্যোতি পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করলে, ভগবান বললেন —বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর অবীচি নরকে গিয়ে অধোমুখসত্ত্বদের উদ্ধার করছেন। উপরের বোধির আলোকের সাহায্যেই এই নরককে অতিক্রম করতে হয়—একদিকে থাকবে আস্পৃহা—আমি উঠবো, রক্ষা পাবো এই নরক থেকে। আর একদিকে থাকবে প্রজ্ঞাঘন করুণা, নামবেন সেই আলো, পরাবোধির দীপ্ত বর্তিকা। এই দুই মিললেই প্রকৃতিকে বদলাবার গূঢ় রহস্যের চাবিটি পাওয়া যায়—

He saw the secret key of Nature's change

তখনই আসে আনন্দের এক অদ্ভুত কম্পন্ (Quivering ecstasy)

তখন রাত্রিই হয় দিব্যের ছায়া, মৃত্যুই অমৃতের কায়া—য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবা যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ—এই দুইই যে একেরই ছায়া।

মৃত্যু যেদিন বলবে জাগো, প্রভাত হ'ল তোমার রাতি
নিবিয়ে যাবো আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।

মানুষের মধ্যে যে দ্বৈতসত্তা আছে, বেদনা মৃত্যু অন্ধকার তার একদিকের প্রতিভূ এ কথা অস্বীকার করা যায়না। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, এ হচ্ছে তামসীর কান্না বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বেদনাদূতীর চোখের জল (Pain is the cry of darkness to the light)

হাতুড়ী দিয়ে না পিটলে, দুঃখের হোমানলে বেদনার বহ্নিতে নিজেকে না পোড়ালে সোনার অলংকার যে গড়া হয়না। ভাগবতী লীলার আর একটা দিক আছে—সেটা হচ্ছে যদি আমিই তিনি, তিনিই সঃ অহং আমি, ত'হলে কেন স্বেচ্ছায় এই অজ্ঞানের আবরণ পরলেন তিনি, সীমার জগতে ঢুকলেন—এ কী তাঁর লীলা, না অভিব্যক্তির স্বরূপ।

মৃত্যুকে জয় করাই সাবিত্রীর যোগ—নিজের আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে তিনি নেতিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই আত্মশক্তি প্রেমের ঘনীভূত শক্তি—কিন্তু এর দুটো দিক আছে—শক্তি এলেই প্রেম আসেনা, জ্ঞান আসেনা, এলেও বিশুদ্ধ পরিণতি নিয়ে আসেনা, আর প্রেমের অশঙ্কিণী বীর্য ও স্থৈর্য না এলে অত্যাচার অনাচার থেকে বাঁচানো যায়না। সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী তাঁর জীবনের এই দ্বৈত 'মিশন'কে রূপ দেবার সুযোগ পেলেন। মৃত্যু তাকে কত লোভ দেখালে—পৃথিবীতে সবইত' মরণশীল, আত্মমুক্তিই তার মধ্যে সব চেয়ে কাম্য—কিছুই থাকবেনা যেখানে সেখানে নিজে বুঁদ হয়ে যাওয়া এমন একটা কাঙ্খিত বস্তু যে সহজেই মানুষ সেটাকে স্বীকার করে নেয়—ধরুন সুখ নেই, শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, ভোগের মাধুর্য গেছে হারিয়ে, ত্যাগের দীপ্তি শুধু সত্তাকে করে তুলেছে কঠোর, জীবনে এসেছে একটা শ্রান্তি, একটা ক্লান্তি তখন মনে হয় স্তব্ধ হয়ে থাকাই বুঝি শান্তির চরম—নির্বাপিত হওয়াই জীবনের শেষ রহস্য—দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি ও মুক্তিই সর্বশেষের গান—তখনি মনে হয় লুপ্ত হয়ে নির্বাণেই বুঝি শান্তি—

If one would cease to be, all would be well.

তা নয়—এই কথাই শ্রীঅরবিন্দের বলবার উদ্দেশ্য। তিনি বলছেন না যে এই ধরণের যোগের দরকার নেই, সবকিছু উত্তরণই—যাত্রাপথের এক একটি বিশিষ্ট ষ্টেশন—কিন্তু পাঁচিল থেকে বেরিয়ে সেই সুন্দর বাগানে পড়ে তার সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে স্তব্ধ নির্বাপিত হয়ে থাকাই সব নয়—অশ্বপতিরা উঠুন দেখুন—দ্রষ্টা পুরুষ (witness) হয়ে থাকুন, কিন্তু তারও পরে কিছু আছে, মনের খেলায়, মুক্তিতে, নির্বাণেই সেই অশেষ, শেষ নন—তিনি যে অনন্ত, তাই মনেরও অতীত স্তর থেকে সেই হিরণ্যগর্ভের শক্তিকে নামতে হয় চেতনার রাজ্যে, বিশ্বাত্মলীন হতে হয় প্রতিটি রন্ধ্রে—একজন উঠলেই হোলনা—সবটুকু লোহাকে যে সোনা হতে হবে ক্ষ্যাপার পরশ পাথরের ছোঁয়ায়।

সপ্তম উল্লাস

কল্পনা করুন—দুঃসাহসিক মানুষ গৌরীশংকরের হিমমজ্জিত তুষার শৃঙ্গে আরোহণ করতে যাচেছ, তার চলার পথ অনন্ত, বাধাহীন, বন্ধনহীন—তার আশার অন্ত নেই, তার ধৈর্যের শেষ নেই, তার বীর্য মহাতুঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মুরতি
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি
দুর্গম দুঃসহ মৌন—জটাপুঞ্জ তুষার সংঘাত।
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে

মানুষের প্রতিনিধি অশ্বপতির যাত্রাও সেই রকমের। তিনি চলেছেন নিরঙ্কুশ হয়ে, ধ্যানী যোগী সমাহিত, অনুভূতির পর অনুভূতিতে প্রকাশময়, একটির পরে একটি শৃঙ্গ উত্তরণ করে, একটির পরে একটি পৃথিবী জয় করে, কামনার জগৎ, মনের জগৎ, ধ্যানের জগৎ (World Stairs)। তিনি কবির ভাষায়—

যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে

উর্ধ্বপথে যেতে যেতে তিনি এমন এক মননের রাজ্যে উপস্থিত হলেন যে—

He broke into another space and time সেই অতিনিভৃত স্তরের শীর্ষে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন যে, তাঁর চতুর্দিকে অনন্তের আভাস, সীমাহীনের সীমা, সেই মহাশূন্যের উর্ধ্বে অবাঙ্মানসগোচর (He Unknowable above)। সেই অনন্ত অমৃত সমুদ্রের ধারে যখন মানুষ পৌঁছয় তখন কি হয়—

All could be seen that shuns the mortal eye
All could be known the mind has never grasped
All could be done, no mortal will can grasp

দৃষ্টি খোলে, মন ধরতে পারে, শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। সাধনার উর্ধ্বতম রাজ্যে এ দৃষ্টি যোগলব্ধ দৃষ্টি—তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি। আনন্দ জাগছে, মূর্ছনা উঠছে, তার শতশত ব্যঞ্জনায় মন অভিভূত হচ্ছে—অপূর্বকে দেখছি, অনাহতকে শুনছি, সীমা লঙ্ঘন করে চলে যাচ্ছি সীমাতীতে। এই স্তরের সাধকের অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করা যায় না। সমপর্য্যায়ে উঠতে পারলে তবে তার রসাস্বাদন করা যায়। এখানে শ্রী আছে, হ্রী আছে, সৌন্দর্য, সুধা। যা কিছু সব অস্মিত্বময় এক নিমেষের রসপ্লাবনে তুমিতে পরিণত, মনের গভীরে অতৃপ্ত আকাঙক্ষা নেই, পরিচয়হীন বেদনা নেই। যত্তু সর্বগতং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্ (ব্যাসদেব) তখনি—

তেরা তেরা ন কছু হমারা,
মেরা মেরা কহত গঁওয়ারা
প্রেম পিয়ালা নূরকা আসীক্ ভর দীয়া
কিন্তু মৈ মতওয়ালা নহি কিয়া দাদু
এ স্তরে সাধক মত্ত নন্, শুধু আনন্দিত।

গীতার দশম অধ্যায়ের পূর্বে জ্ঞান ছিল সবই পরমের অংশভূত চেতনা।

যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

অর্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখতে চাইলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমি তো শুধু ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে নেই, বলে দর্পে, ধৈর্যে বীর্যেও আছি, সংহারের মহাকাল মূর্তিতেও আমি। সব নিয়ে যে প্রকাশ—চিন্ময় মৃন্ময়—সেই অনন্ত সত্তার বিকাশ যে আমারই মধ্যে। সেই হলো "পরমোগুহ্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং" জ্ঞান। এই জ্ঞান হলেই মোহ দূর হয়, শোক অপহৃত হয়। পার্থকে ডেকে বললেন—দেখো, চোখ চেয়ে দেখো, আমার কতো রূপ, কতো রং, কতো রস।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥

তিনি যে শুধু ফুলে ফলে অনলে অনিলে ধুলোয় মাটিতে কাদাতে,-- --এ শুধু কবির কল্পনা নয়, যোগলব্ধ দৃষ্টি। মানুষকে এত বড় আশ্বাস আর কিসে দেয়? আমি পাপই করি আর অন্ত্যজই হই আমার সুখে আনন্দে শুধু নয়, দুঃখে বেদনায় শুধু নয়, বাসনায়—কামনায় নয়, আমার প্রতিটি রোগে, প্রতিটি তন্ত্রীতে তন্তুতে সবই তুমি। বিশ্বরূপ দর্শন হলেই, বিশ্বছন্দের মধ্যে লীন হওয়া যায়, খণ্ড সত্তার বুদ্বুদ ডুবে যায় অখণ্ডের মহাসমুদ্রে। তখন সেই অনন্তময় হন অপ্রমেয়—মাপা যায় না তাঁকে, সেই দীপ্তানলার্কদ্যুতিতকে, সেই পরম বেদিতব্যকে—

সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্

কিন্তু এর আর একটি দিক্ আছে, সেই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন। —অর্জুন যখন দেখলেন সেই পরমং রূপমশ্বৈরম্, দেখলেন

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্

তখনও তিনি 'নর' জিজ্ঞাসু, আর্ত্ত, প্রত্যর্থী, তখনও তিনি নারায়ন নন্।

পূর্বেই বলেছি যে, এই স্তরে উঠলে সাধকের অন্তর্জীবন বিচিত্র হয়ে ওঠে।

In plots of pain and dramas of delight. কিন্তু এ বেদনা আমাদের সাধারণ বেদনা নয়। এ বেদনাবোধ নবজীবনের জন্য প্রসববেদনা। মা যখন অন্ধকারের গর্ভ থেকে একটি খণ্ড জীবনকে বের করে আনেন তখন তার সবস্ত সত্তা একীভূত হয় একটি প্রকাশে, সেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত ভোগ, সমস্ত ক্লেদ, অবসাদ কেন্দ্রীভূত হয়ে বিশ্বের অঙ্গনতলে একটি নব জীবনকে নিয়ে এলো। সে বেদনা মহান আনন্দেরই আবরণ। অসীমের লীলাপথের সৃষ্টির রূপান্তর। বীজ রূপে সম্প্রসারণের কামনায় যা ছিল আমাদের মনে উপ্ত অব্যক্ত, তাই হলো ব্যক্ত।

আমাদের শারীরিক ধর্মের প্রধান চক্র হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে। এর চলার বিরাম হলেই, সব শেষ। আমাদের মনও তেমতি অতন্দ্র বিনিদ্র-- তার দেখার শেষ নেই, জানার অন্ত নেই, তার বোঝার ক্লান্তি নেই।

অশ্বপতি দেখছেন—

There walled apart by its own innerness
In a mystical barrage of dynamic light
He saw a lone immense high-curved world pile
Erect like a mountain chariot of the gods
Motionless uuder an inscrutable sky.

উপরে নীল আকাশ, নিম্নে নিমীল পৃথিবী—সেই সীমাহীন মহাশূন্যে, সংখ্যাগণনার অতীত লোকে, তার চক্রতীর্থের পথে পথে শত শত ভাঙা-গড়া ওঠা-পড়ার ইতিহাসের অবশেষ ভিড় করে আছে। বাইরের বৈজ্ঞানিক জগতে একথা যেমন সত্য, ভিতরের অন্তর্জগতে এই একই সত্য। কত অনভূতির শূন্যে দুলতে দুলতে সাধক এগিয়ে চলেছেন—হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল—

A mystical barrage of dynamic light কল্পনা করে নিন, একটা বিরাট্ ড্যামের ফ্লুড্গেট খুলে দেওয়া হয়েছে, তার উপর পড়ছে লক্ষ লক্ষ ভোল্টের নিয়ন লাইটের জেল্লা। আর দূর থেকে দেখছেন আপনি সেই আলোকোদ্ভাসিত জলস্রোত। কবির উপমা অনেকটা এই ধরনের। সেই আলোর পারেতে তিনি দেখছেন স্তূপীকৃত পাইল—জগতের পর জগত প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, যেন পাহাড়ের পর পাহাড় থরে থরে সাজানো। আর সেই পথ বেয়েই জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলেছে। জড়তায় ভিত্তি (Substructure) কিন্তু জড়াতীতে তার স্ফূর্তি

অশ্বপতির নজরে পড়ল—

A subtle pattern of the Univese

এক কথায় কবি বললেন, গাঢ় সংবদ্ধ মন্ত্রের মতো—

It is within below, without above.

এই যে দ্বিমুখী সত্তার সমুদ্র—এইখানে আমরা ভাসছি। মাটি আর আকাশ দুইই মিলেছে এই গভীরের আধারে উর্ধ্বে অধে, অস্তিত্বের প্রশান্ত মহার্ণবে।

সেইজন্য সেইখানে আমি আর তুমি মিলে যায়—
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন।
অঙ্গ ওঠে ভরে।

Out of the Swoon of the Inconscience
It labours towards a Superconscient Light.

অজ্ঞানের তিমিরাঘাতে মূর্চ্ছিত সত্তাকে জাগিয়ে বলতে হবে—তুমি শুধু অমৃতের পুত্র নও, তুমি নিজেই অমিতবিত্ত, বেদান্তের সোঽহং, নিজেই অমেয় অমৃত। সেই আলোকে চিনে নাও নিজেকে, ডুবিয়ে দাও সমস্ত সত্তাকে, পরশ পাথরের স্পর্শে সোনা হয়ে উঠবে সব কিছু কালো। এই "হওয়াই" Becoming হচ্ছে আসল—উর্ধ্বের অভি-ব্যক্তির চাবি সেইখানে।

—মানুষ হচ্ছে—সীমার মাঝে অসীমের একটি স্ফুলিঙ্গ, সময়ের গণ্ডিতে নামরূপের 'মিত' সীমানায় একটি প্রকাশ।

"মায়া" বলতে কী বোঝায় এ নিয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা যায়, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাব্যে এই 'মিত' ভাবকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে মায়া বলে।

কিন্তু কেন **To live this mystery out, our souls come here,** আমরা হচ্ছি সবাই লীলাসহচর লীলাসহচরী—শুধু সান্নিধ্যই কাম্য নয়, সামীপ্য সাযুজ্য ও একত্ব, বিশ্ব আর বিশ্বাতীত এক অপূর্ব রতিতে মিলিত।

রূপ গোস্বামী রতিকে সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে ত্রিবিধ স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। কুব্জার রতি সাধারণী সেখানে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রবল। কৃষ্ণমহিষীদের রতি সমঞ্জসা অর্থাৎ সেখানে সমান পরিতৃপ্তি বিধান। সমর্থা রতিতে দয়িতের সুখ সংবিধানই শেষ কথা। তাই তাঁদের সাধন লীলায় সিদ্ধান্তীরা বললেন—

নীর না ছুঁইবি
সিনান করিবি

ভাবিনী ভাবের দেহা (চণ্ডীদাস)

এইখানেই প্রেম হয় নিকষিত হেম, রজকিনী বেদবাদিনী

রসিক রসিক সবাই কহয়ে

কেহত রসিক নয়

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে

কোটিতে গোটিক হয়। ((চণ্ডীদাস)

অষ্টম উল্লাস

মানুষ হচ্ছে চিরকালের যাত্রী—তার চলার শেষ নেই, তার পরিক্রমার অন্ত নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পড়ি যে, রোহিতকে উপদেশ দিচ্ছেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র—

নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা।
চরৈবেতি চরৈবেতি।

চলতে চলতে যে শ্রান্ত হয় তার আর শ্রীর অন্ত থাকে না। যে চলে ইন্দ্র সেই পথিকজনের সখা—যে চলে না, অর্থাৎ যার মধ্যে dynamism নেই, সে শ্রেষ্ঠ হলেও নীচ—অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই মন্ত্রের যিনি হোতা তিনি একজন দাসীপুত্র—শূদ্রাণীর গর্ভজাত। তাঁর পিতা একদিন যজ্ঞস্থলে তাঁর অন্য পুত্রদের শিক্ষা দিলেন কিন্তু এই পুত্রটিকে কিছু পাঠ বা উপদেশ দিলেন না। তীক্ষ্ণধী বালক সে তার মাতার কাছে লুটিয়ে পড়ে বললে—মা, বাবা আমাকে চিনতেই পারলেন না—আমি যে শিখতে চাই, জানতে চাই, কার কাছে পাঠ নেবো। মা কেঁদে বললেন—মা বসুন্ধরা, তুমিই এর শিক্ষার ভার নাও, এর পিতা একে গ্রহণ করলেন না; আমার প্রেম ভালবাসা সবই মিথ্যা হবে তাতো নয়, তার এই একটি বিশিষ্ট রূপ আমার সন্তান, তাকে তোমার হাতেই দিলুম। মাতা বসুন্ধরা বললেন—ভয় নেই বাছা, সব জ্ঞানই আমার মধ্যে নিহিত। এই অতি পুরাতন সত্যটিকে শ্রীঅরবিন্দ আবার তুলে ধরলেন—যে স্থূল বলে, জড় বলে, বিষয় বলে, কোনো আলাদা জিনিস নেই, মৃৎশক্তির মধ্যেই আছে চিৎশক্তি সংবৃত, যিনি চিন্ময় তাঁর বিলাসের ভূমিই হচ্ছে এই মৃন্ময় তনু। মাতা পৃথিবী ছেলেকে সুশিক্ষিত করে ফিরিয়ে দিলেন মায়ের কাছে—সেই ছেলেই লিখলেন সে যুগের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—ইতরার পুত্র মহীদাস, যাঁর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কিন্তু স্বর্গের সঙ্গে ঊর্ধ্বের সঙ্গে নিত্য মিতালী।

শ্রীঅরবিন্দ সাধনার এই হলো বড় কথা—সাধনা হবে শুধু সূর্য-মুখী নয়, সর্বমুখী, জীবনবিমুখী নয়, জীবনকে নিয়ে। আত্মস্ফুরণের প্রতিটি দল শতদল হয়ে ফুটে উঠবে, প্রজ্ঞার শিখায়, কর্মের ধারায়, প্রেমের উাসে এক চৈতন্যময় আধারে। তখন অহং হবে—কার? না তাঁর বা পরমহংসদেবের কথায় মার—আমার—'আ' টা কেটে।

—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীতে অশ্বপতির মাধ্যমে মানুষের সেই অপূব তীর্থযাত্রার এক অতিমানস কল্পনা আমরা পেয়েছি। অশ্বপতি মানবাত্মার প্রতীক—মানুষ দিব্যের স্পর্শ পেয়েছে মাতাভূমির কাছ থেকে—তার ভবিষ্যত হচেচ তার অতীতে ফিরে যাওয়া, যেখান থেকে সে এসেছে, বৃত্ত পূর্ণ করতে হবে তাকে, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যাবে—এই আকুতি সমস্ত সৃষ্টির, এই জন্যই তার যত আলোড়ন, স্পন্দন, কম্পন—সে চাক্ বা না চাক্—এই অভিব্যক্তির ঘূর্ণীচক্রে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে, শুধু যতটা পারে তাড়াতাড়ি খেলাটি শেষ করা, মহাপ্রকৃতির লীলাসহচর বা লীলাসঙ্গিনী হওয়া। অশ্বপতির মনে একটির পরে একটি পর্দা উঠে যাচেচ, পাহাড়ের পর পাহাড় তিনি অতিক্রম করছেন। সাধকের প্রথম লাভ হয় চেতনার মুক্তি। মানুষ আর পশুর মধ্যে বিবর্তনে ভেদ যেটুকু সেটুকু হচেচ এই যে, মানুষের মধ্যে মহাপ্রকৃতি আরো একটু প্রকট হয়েছেন—আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছাড়াও তার চেতনা জলে উঠছে এক অতীত স্মৃতিতে, সে জেগে উঠেছে আত্মবিস্মৃতি থেকে কিন্তু সেই আত্মদীপ্তি চির ভাস্বর নয়, সে মশাল নিভে যায় বারে বারে, সে ভুলে যায়—

> A Greater destiny may be his
> He can recreate himself and fashion
> New the world in which he lives.

সে নিজের পুনর্নির্মাণ করে নিতে পারে—এখনি, আজ, ইহৈব—এইখানে। সে শক্তি তার আছে, সে শক্তিধর, নব বিশ্বামিত্র সে—এই পৃথিবীকেই সে নূতন করে ছন্দায়িত রূপায়িত করতে পারে, শক্তির, জ্ঞানের প্রেমের কেন্দ্র করে তুলে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের Thoughts and Aphorisms-এ (শ্রদ্ধেয় নলিনী গুপ্ত অনূদিত ও বর্তিকায় প্রকাশিত) একটি কথা মনে পড়ছে—যখন আমার কোন জ্ঞান ছিল না, তখন দোষীকে, পাপীকে, অশুদ্ধকে, ঘৃণা করেছি, নিজেই আমি দোষে পাপে অশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ ছিলাম বলে। কিন্তু যখন আমি পরিশুদ্ধ হলাম, দৃষ্টি আমার খুলে গেল তখন অন্তরের অন্তরে আমি নত হলাম তস্করের আর হত্যাকারীর সম্মুখে, বারবনিতার চরণে আমি পূজা দিলাম—কারণ আমি দেখলাম, এইসব জীবেরাই অশিবের নিদারুণ ভার স্বীকার করে নিয়েছে, আমাদের সকলের হয়ে সবচেয়ে বেশী পান করেছে জগৎ-সমুদ্রের মন্থন থেকে উত্থিত হলাহল।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং—এই পরিপূর্ণবোধ না এলে এই আশ্বাস আসে কোথা থেকে —কাকে ঘৃণা করব, কাকে পূজা করব, কার প্রতি বিরূপ হব। এর পরের কথাই তাই—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ।

ত্যাগের দ্বারা ভোগ—বৃহতের স্বভাবই যে তাই—সকলকে দেওয়া মানেই ভোগ করা—তাই যিনি বৃহৎ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম তিনি নিজেকে না দিয়ে পারেন না। আত্মাহুতি দিচ্চেন তিনি। যজ্ঞ হচ্চে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ অর্থাৎ আত্মত্যাগ। যজ্ঞ আর যজ্ঞেশ্বর কিন্তু আসলে এক। তিনিই আহুতি দিলেন নিজেকে সর্বাগ্রে, ক্লেদক্লেশকামনার আবরণ পরলেন, অবতরণ করলেন, কারণ মানুষী-যজ্ঞে হবে আবার উত্তরণ। এই নামা আর ওঠা, দেওয়া আর নেওয়া, চাওয়া আর পাওয়া, আমাদের নিত্য পূজা, ধ্রুবা স্মৃতি, কাম-সংকল্প। নরাকারই যে নিরাকার। 'আমায় পাছে সহজে বোঝ তাইতো এত লীলার ছল।'

নবম উল্লাস

হে মহাপথিক, অবারিত তব দশদিক্‌—চলেছেন যাত্রী মানুষের প্রতীক অশ্বপতি, শুধু তপস্বী, যোগী, রূপান্তর প্রয়াসী নন্‌, তিনি চলেছেন অমেয়ের রাজ্যে, ত্রিকালের-ত্রিকায়ে, মহাকালের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, অভাবিত কল্পনাতীত লাভের আশায়। অনুভূতির পর অনুভূতি এসেছে, লোক থেকে লোকান্তরে দৃষ্টি গেছে চলে, যুগ থেকে যুগান্তর পেরিয়ে, বিশ্বের পর বিশ্ব অতিক্রম করে, চিন্তায়, মননে, ধ্যানে। তিনি পেয়ে গেছেন বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বলীন এক অপূর্ব গুহ্যতম গূঢ়তম রহস্যের আভাস। কে সে, কী সে ,কেন সে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসেছে, প্রতি প্রশ্ন জেগেছে, রহস্যের একটি একটি করে গ্রন্থি মোচন হয়েছে, দীপ জ্বলে উঠছে—জ্ঞানবর্তিকা, সমস্ত আকাশ বাতাস, স্থিতি ব্যাপ্তি, চেতনা ব্যঞ্জনা মিলে সেই আলোর দীপ্তি।

মনকে নিয়েই যতো আমাদের গোলযোগ, তাকে বশে আনা বায়ুর মতো সুদুষ্কর, তবু উচ্চতর মন, ভাস্বর মন, অধিমানস মনের স্পর্শ পান সাধকরা, কবিরা, শিল্পীরা (Higher Mind. Illumined Mind, Over mind)—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বললেন—মনের অতীতকেও (Supermind) জানতে হবে, বুঝতে হবে, পেতে হবে, তাকে সত্তায় সত্তায় শিকড়ে শিকড়ে ছড়িয়ে দিতে হবে—জীবনের এই পর্ব, চিন্তার এই ধারা, চেতনার এই বিভাস, শুধু গ্রহণ করে করে উত্তরণে ওঠাই নয়; একে সর্বগ্রাসী' সর্বপ্লাবী করে সর্বাধারে নামিয়ে আনতে হবে—স্বর্গের ত্রিদিবেশ্বর থেকে মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—শুধু তিনিই তিনি নন্‌—তিনি সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাস, তিনি ওতপ্রোতভাবে জীবনের প্রতিটি ছন্দে, সংস্কৃতির প্রতিটি চরণে, ধেয়ানে তন্দ্রায় নিবেদনে সর্বত্র সমানভাবে সক্রিয় হবেন। এই অপূর্ব আশাই শ্রীঅরবিন্দের, তাঁর সাবিত্রী-সাধনা সেই পরমলাভের জন্য—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন—

> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

অশ্বপতি, যিনি পৌরুষের প্রতীক (ছান্দোগ্যের পঞ্চম প্রপাঠকে আর এক অশ্বপতির কথা পড়ি—ইনি কেকয় রাজার পুত্র, ইনি বৈশ্বানর বিদ্যা লাভ করেছিলেন) —সেই বিরাট্ পুরুষের কথা জেনেছিলেন, যিনি সর্বেশ্বর চিৎ, ও অচিৎ নিয়ে শক্তিধর—

> অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্যৌ
> দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ
> বায়ুঃ প্রাণঃ হৃদয়ং...হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা

কিন্তু এই যাত্রার পথে একটি, অবশ্য কর্তব্য কর্ম আছে—সেটি হচেচ 'রাত্রিগর্ভে অবতরণ' (The Descent into Night)। সাবিত্রীর সপ্তম পর্বে শ্রীঅরবিন্দ সেই রহস্যই বিবৃত করলেন। অশ্বপতি এখন উপযুক্ত আধার, যোগক্ষেম, শান্ত, সংযত, তপস্বী, মনস্বী, প্রাণের ভঙ্গিমা থেকে তাঁর মন মুক্ত, স্তব্ধ, অপ্রগল্ভ, চিত্তের বিকার নেই, দৃষ্টি অন্ধ নয়, অশ্রুর বন্ধন নেই, অজ্ঞানের শৃঙ্খল নেই—

> (A mind absolved from life, made calm to know
> A heart from the blindness and the pang,
> The Seal of tears, the bond of ignorance)

কিন্তু তবু তিনি সম্পূর্ণরূপে পাচেচন না, হচেচন না, জানছেন না, কেন, কিসের জন্য এই অসাফল্য (that wide wide failure's cause)। অশ্বপতি তাকালেন সেই বিরাট্ ঘুমন্ত অনন্তর দিকে, তিনি ভাবলেন—

> তোমাতে আমাতে একত্তর

কিন্তু সে যাত্রা—

> কী হবে শুধু ভয়ঙ্কর

না, চোখের ঠুলি খুলে গেলো, দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখলেন, (awakened nescienee) গলদ্ কোথায়।

প্রথমতঃ—মহাপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত গভীর সত্তাকে, তার আবরণকে ছিন্ন করতে হয় (The veil was rent that covers Nature's depths)।

দ্বিতীয়তঃ–কেন এই স্থায়ী বেদনা, তার উৎস কোথায়, জানতে হয় (The mouth of the world's lasting pain)।

তৃতীয়তঃ—সেই নিবিড় আমার তিমির গহ্বর—যার ভিতর বাহির কালোর কালো (the mouth of the black pit of ignorance) তার অনুসন্ধান করতে হয়।

চতুর্থতঃ—দেখা যায়, যেন একটা অতিকায় দৈত্য সেই গহ্বর পাহারা দিচেচ—মাথা তুলছে, দেখছে মানুষকে (the evil guarded at the roots of life raised up its head and looked into his eyes (প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে বোরিস্ প্যাস্টারনিকের একটি কবিতা, যেখানে ড্রাগনের সঙ্গে যাত্রী মানুষের যুদ্ধ হলো—এই ধরনের প্রতীক ও রূপক, সব সাহিত্যেই মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়—ভালো মন্দর পূর্বাভাস হিসাবে)।

দশম উল্লাস

কালকে অতিক্রম করে, সীমাকে লঙ্ঘন করে, অজ্ঞানকে পরাভব করে, চিরকালের সত্য নিত্য মানুষ তার দৈবী-স্বভাবকে পুনরায় এই মাটির আধারে প্রতিষ্ঠিত করবে এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন। সেই স্তরে উঠলে—

All could be seen that shuns the mortal eye
All could be known the mindhas never grasped
All could be done no mortal will can dare

সবকিছু তখন দেখা যায়, সবকিছু বোঝা যায়, সবকিছু করা যায়। কিন্তু সাধারণত এই আভাসকে সম্পূর্ণ ধরে রাখা যায় না—সম্পূর্ণভাবে গ্রহিষ্ণু মন, সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ না হলে।

সাধকের যখন এই অনুভূতি আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব-শক্তি, একটা আগুন, একটা আলোর দিব্য বিভাসও আসে। শ্রীঅরবিন্দ 'সাবিত্রীতে' অশ্বপতির যোগে তারই অপূর্ব কাব্যময় বর্ণনা দিয়েছেন।

A strong descent leaped down. A night, a flame, a beauty half visible with deathless eyes, a violent ecstasy and sweetness dire.

তাই শ্রীঅরবিন্দের উপমায় আমরা পেলাম এই কথাটি—half visible—যেন আধেক দুয়ার খোলা। চেতনার উন্মেষের প্রথম স্তর তাই কালবোশেখীর ঝড়ের মতো—এমন একটা দুর্দান্ত রভস আবেশ যেন প্রচণ্ড প্রথম প্রণয়পরশের সর্বগ্রাসী মুগ্ধতা—

Into the magnitude of God's embrace
Abolishing the agent and the act.

কর্তা ও কর্ম দুইই এক—তন্ত্রে একেই বলে কুণ্ডলিনীর জাগরণ। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী স্বরূপ জ্যোতিরেব জেগেছেন, তাঁর ক্রিয়া

আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তখনও অনবিচ্ছিন্না পরাশক্তির সঙ্গে পরমশিবের মহামিলনের লগ্ন এসে পৌঁছয়নি—প্রকৃতি পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি—শিব তখনও নিদ্রিত—তারই বুকের উপর নাচছেন প্রকৃতি, কালী কপালিনী উলঙ্গিনী হয়ে। মানুষ তখন পাহাড়ে উঠতে উঠতে, ঝড়-ঝাপ্‌টা-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একটি আশ্রয় দেখতে পেয়েছে, একটি গুহা।

He found the occult cave, the mystic door. সেইখানে, সেই hidden chamber-এ রয়েছে—record graphs of the Cosmic scribe—যে মহাগণেশ লিখে চলেছেন দৃশ্য ও অদৃশ্য বিধিলিপি, তারই Book of Beings' index page. বই সম্পূর্ণ পড়া হয়নি, শুধু সত্তার সূচীপত্র চোখে পড়ছে। the secret code of the history of the word, সেই গূঢ়তম গহ্বরেই সংকেত। যাত্রী-মানুষ পড়তে বসলো সেই Book of Life. দেখলে পূর্বসূরীরা মার্জিনে প্রজ্জ্বলন্ত টীকাভাষ্য লিখে গেছেন—Dotting with light the crabbed ambiguous scroll তার কাজ হলো—

Rescue the preamble and the saving clause of the dark agreement

সেই কালো চুক্তিপত্র থেকে তার মুখবন্ধটিকে উদ্ধার করে আন—সেইটেই যে আসল প্রতিশ্রুতি—

The mystery of God's covenant with the night. সাধনার দ্বিতীয় স্তর তাই হলো চেতনার ব্যাপ্তি—ছোট আমি আর নেই—সবই বড় আমি শুধু নয়—সবই তুমি।

A sleeping beauty opened deathless eyes—সোনার কাঠির পরশে সুন্দরী দেবকন্যা জেগে ওঠে মৃত্যুহীন চোখ মেলে। কঠোপনিষদের ভাষায় এই তো তিনি যিনি জেগে থাকেন ঘুমন্তদের মাঝে। অশ্বপতি আরো এগুলেন—তিনি শুধু উঠবেন না, তিনি নামিয়ে আনবেন—সুন্দরী কলস্বনাকে—গঙ্গোত্রীর শিখর থেকে ভগীরথের মতো।

কিন্তু এরও পরে আরো একটি স্তর আছে যেখানে চেতনার সমত্ব আসে—প্রশান্তি, স্থৈর্য, অপ্রমত্ততা, স্তব্ধতা—গাঢ় আত্ম-সমাহিতির মধ্যে নয়, সম্পূর্ণ কর্মময় জাগ্রত জীবনেও। চেতনার মুক্তি এলেই সাধকের

অন্তর্জীবন বিচিত্র প্রকাশময় হয়। কিন্তু তখনও বেদনায় বাঙ্ময় ও আনন্দে মুখর এই জীবন নাটক (In plots of pain and dramas of delight) যদিও এ বেদনা সাধারণ বেদনা নয়—নব-জীবনের জন্য প্রসব-বেদনা—মাতা যেমন জননী-জঠরের অন্ধকার থেকে অজাতভুবন ভ্রূণকে আলোর অঙ্গনতলে এনে দেন বেদনার মাধ্যমে। তাই কবি শ্রীঅরবিন্দ বললেন—

This higher scheme of being is our cause
And holds the key to our ascending fate.

চাবিকাঠি এইখানে—মানুষ হচ্ছে,

Infinity put on a finite soul

সীমার মাঝে অসীমের স্ফুরণ।

প্রাচীনকালের ঋষিরা ধ্যানের মন্ত্রের মধ্য দিয়ে অসীমকে সীমার মধ্যে এনে দিলেন—একালের কবি-ঋষিরাও সেই প্রতীককে গ্রহণ করলেন। সাবিত্রী মন্ত্র তারই রূপক। এক সীমায় রইল বিশ্বভুবন, আর এক কোটীতে রইল বিশ্বাতীত চেতনা—ত্রিভুবন ব্যেপে, ত্রিকাল নিয়ে ঐযে সবিতা আমার চোখের সামনে প্রতিদিন আলোর ধারায় নামছেন তাকেই কল্পনা করে নিলাম দিব্যের প্রতীক হিসাবে। মন্ত্র উঠল উচ্ছাসে—তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—তুমি ব্রাহ্মী, তুমি বৈষ্ণবী, তুমি মাহেশ্বরী—তুমি সৃজন করো, পালন করো, সংহার করো। রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমাদের ধ্যানের মন্ত্রের একদিকে রয়েছে ভূর্ভুবঃস্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে ধী, অর্থাৎ আমাদের চেতনা—এই দুই নিয়েই আমার বরণীয় দেবতা। শ্রীঅরবিন্দ এই গায়ত্রী মন্ত্রকেই আরো একটু নতুন রূপে ধরলেন—

তৎসবিতুর্বরং জ্যোতিঃ পরস্য ধীমহি—
যন্নঃ সত্যেন দীপয়েৎ

সবিতার সেই শ্রেষ্ঠ রূপ, পরমের সেই জ্যোতি আমরা ধ্যান করি—যে তার দীপ্তিতে আমাদের প্রদীপ্ত করে তুলবে।

Let us meditate on the most auspicious (best) form of Savitri i.e. the light of the Supreme which shall illumine us with Truth.

এই আলোর সাধনাই যে অমৃতের সাধনা, সাবিত্রীব্রত, যম-তপস্যা—

ওরে মন, খুলে দে মন যা আছে তোর খুলে দে
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে

কিন্তু কবি ও সাধকের দৃষ্টিতে আলো আর অন্ধকার যে এক হয়ে আসে, কারণ মহাতামসীর গর্ভেই যে আলোর উৎস। রাত্রিই দিনকে জন্ম দিচ্চে। শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ সেই বৈদিক উষাকেই আহ্বান করলেন তাঁদের কাব্যে—

তমো আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে

তিনিই ছিলেন—

যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি

জড়-প্রকৃতি যখন মৃত্তিকার আবরণ থেকে প্রথম জেগে উঠলো, যখন নীরব অণুর মধ্যে জাগলো আলোড়ন, তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দিয়েই হতো সবকিছুর আস্বাদন, সেই মানদণ্ডেই তার সুখ-দুঃখ নির্ণীত হতো, তার আরতিও যেমনি বিরতিও তেমনি। কিন্তু মানব-সত্তার সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হলো বৃহত্তর সত্য, কবি ইয়েট্সের ভাষার উপমা নিয়ে (অর্থ নিয়ে নয়) Four ages of Men, একটু বদলে বলা যেতে পারে—

He with the body waged a fight
But body won ; it walks upright
Then he struggled with the heart
Innocence and peace depart
Then he struggled with the mind
His proud heart he left behind
Now his wars on God begin
At stroke of midnight God shall win.

অভিব্যক্তির প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হলো দেহ নিয়ে—শিশু চেষ্টা করছে পায়ে দাঁড়াতে, বানর চেষ্টা করছে ন্যুব্জ দেহকে সোজা করতে। মানুষ

জিতে গেলো—স্থূল-বিজয় হলো তার। তারপর প্রকৃতি তার সঙ্গে যুদ্ধ করলে, মনের পাশবিক স্তর অর্থাৎ emotional life বা heart নিয়ে—অর্থাৎ তার কাম-কামনা, জিঘাংসা, জিগীষা, লোভ, রিরংসা দিয়ে—শৈশবের সারল্য গেলো, শান্তি গেলো। মানুষ সেখানেও জিতলো—শুধু জৈব ইমোশনের কাছে সে নত হলো না। তখন যুদ্ধ হলো মনের ঊর্ধ্বস্তরের সঙ্গে অর্থাৎ Mind-এর সঙ্গে—তার সংশয় আসে, সন্দেহ আসে, সে তর্ক করে, প্রশ্ন করে, agnostic, sceptic হয়--এখানে যখন সে জিতবে তখন তার কাছে সত্য প্রতিভাত হবে মুখোমুখী--তখন সে পরম সত্যের সঙ্গে এবং পরম সত্যের জন্য যুদ্ধ করবে। এটা হচেছ তার অভিব্যক্তির যুদ্ধ।

একেই তিনি বললেন, মৃত্যুর করালছায়া দেহের শুধু অবসান নয় এবং এরই জন্য দুঃখ, শোক, তাপ, বেদনার জ্বালা (error, grief, pain), একটা বিকৃত বিদ্বেষযুক্ত মন (A hostile and perverted Mind). তবু আছে সেই সত্যশিবসুন্দরের (Truth, Joy and Light) আলো, প্রতিদিনই আসছে আমাদের কাছে আত্মার বাণী হয়ে, কিন্তু ভিতর থেকে সে বাণীকে কে যেন ছিন্ন করছে, বিকৃত করে দিচেছ, ভিন্ন করে দিচেছ আমার সত্তা থেকে (Intercept), মুছে গেছে অনন্তের পথের নিদর্শনগুলি (Effaced the signposts of life's pilgrimmage), কেটে গেছে প্রিয়দর্শী জীবন দেবতার প্রস্তর অনুশাসনগুলি (Cancelled the firm rock edicts graved by time)। মানুষের মধ্যে যখন সেই দিব্যবিভব অনুভূতিগুলি হারিয়ে যায় তখনি আমরা বিচ্যুত দেবতাত্মা (fallen angels), স্বর্গ হতে বিদায় নিয়েছি, আর পৃথিবীকেও স্বর্গ করতে পারিনি। শ্রীঅরবিন্দ বারে বারে বলেছেন—

Our earth starts from mud and ends in sky, শুধু পৃথিবীর মানুষই উঠবে না, স্বর্গের অসীমাচলে, স্বর্গ জন্ম নেবে মাটি মায়ের কোলে।

রাত্রির অন্ধকারে যখন সত্তা নিমজ্জিত হয় তখন জীবনের মহিমা কলুষিত, সন্দেহ আসে, নিবেদিত হয় না মন প্রাণ জ্ঞান ধ্যান ধারণা চেতনা, আনন্দে সত্যে বিধৃত নয়, তখন সত্যবান্‌কে পাবো কোথায়, সে যে গতচেতন, হৃতবীর্য, মৃত, কথায় ও কাহিনীতে পর্যবসিত,

আনন্দলাভ যেন একটা ক্লান্ত শিকারের পরিক্রমা (The Truth, a fiction, the chase of joy was now a tired hunt)

শ্রীঅরবিন্দের চেতনায় প্রশ্ন জাগলো—কেন? কেন এই নরকের সূচনা?—কিন্তু সত্তাকে সব দিক থেকে জানতে গেলে এরও একটা উদ্দেশ্য আছে—এখানে শুধু আত্মপ্রাপ্তি নয়, আত্মভ্রান্তি, আত্মপ্রবঞ্চনারও মূল্য আছে। সেই অশিবকে, অমঙ্গলকে, জ্যোতির আবরণে দেখা যাচ্ছে—যেন সে এক সাহায্যকারী দেবদূত—তার শক্তি আছে, প্রাচুর্য আছে, (a lavish sense he gave of power and joy), তার ভিতরে আছে তর্কের ক্ষমতা, মিথ্যাকে সে আপাতসত্য বলে প্রতিভাত করতে পারে, শাস্ত্রবচন সে আওড়াতে পারে যেন স্বয়ং ভগবান্ উবাচ।

(His rigourous logic made the false seem true
Amazing the elect with holy love
He spoke as with the very voice of God)

এই হলো এক ধরনের দ্বন্দ্বের ও সম্মোহের জগৎ—এই হলো নরকের সূচনা। নরক তো মৃত্যুর পর কোনো স্থান নয়, মনেরই বিচিত্র ক্ষেত্র। কুম্ভীপাক, রৌরব, অবীচি সবই প্রতীক। পাপপুণ্যের হিসাব হচ্চে নিক্তির তৌলে, স্বয়ং চিত্রগুপ্ত খতিয়ান্ লিখছেন, যমরাজ করছেন বিচার, যমদূতরা মারছে ডাণ্ডা, অগ্নিদগ্ধ হচ্চে পাপীতাপীরা—এ সবই মনের অভিসার, বিচিত্রের খেলা, কৃতকর্মের আরব্ধ ফল। সূক্ষ্ম চেতনায় হচ্ছে তারই হেরফের। শ্রীঅরবিন্দ এর ছবি আঁকলেন—আমরা যেন একটা প্রাচীন অজ্ঞাত শহরের অধিবাসী, সেখানে আলো নেই, অর্থাৎ জ্ঞানের আলো, তপস্যার জ্যোতি, মননের স্নিগ্ধ বিভা নেই—সেখানে অপরের মধ্যে যা আমরা ঘৃণা করি, নিজেরাই তাই করি। (They did what in others, they would persecute) এর একটি সুন্দর উপমা তিনি দিলেন, যাকে বলা যেতে পারে ধর্মান্ধতার নরক। আমি ভগবান্কে যে রূপে জানি বলে গলাবাজি করি, পূজা করি, সেই হলো ভগবানের প্রকৃত রূপ আর সব নকল; অতএব সাধু সাবধান, বিধর্মীদের মারো, কাটো, তাদের পুতুলকে ফেলে দাও, রক্তের নদী বহিয়ে দাও। ইতিহাস বলে, ধর্মের নামে কতো অত্যাচার

অনাচার অবিচার মারামারি কাটাকাটি সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডা হয়েছে তার ইয়ত্তা, নেই। কোয়েকার, ব্যাপটিস্ট, ক্যালভিনিস্ট, মরমন্ থেকে আউল বাউল কৌল, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, কুলীশ, কতো মত কতো পথ বেরিয়েছে, কিন্তু কেউ বলেনি এই সেদিন পর্যন্ত যে 'যত মত তত পথ'।

এই রক্তস্নাত সিংহাসনে অন্ধ দেবতার সামনে মানুষকে একবার থমকে দাঁড়াতেই হয়, এখানে মিথ্যা যে সত্য, সত্য হয় মিথ্যা। (A lie was there the truth and truth a lie) কিন্তু তারি ভিতরে সত্যিকারের মানুষের কান্না বেজে ওঠে শরণের নাম নিয়ে, নামের শরণ নিয়ে (A prayer upon his lips and the great name.) কবির ভাষায় বলতে চায় সে

রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে

বেদনা দূতী তাই গান গায়

তোমার লাগি জাগেন ভগবান্
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান
জাগেন ভগবান্।

কিন্তু এই স্তরেরও নীচে আরো গভীরে আরো কালো, আরো অন্ধকার আছে—যেখানে মহাতামসী প্রকৃতি যেন ভ্রষ্টা রমণীর মতো কুহকিনী—সবই বিকৃত হয়ে আসছে মনের আসরে—(repulsion), যন্ত্রণা (agony), ঘৃণা (hatred), ইচ্ছাকৃত আঘাত (torture)। এখানে জীবনের সত্যকার মানবিক প্রকাশ নেই, সবই অস্বাভাবিক। এই সব অন্তঃশত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতেই হবে—এ থেকে পার নেই,

নিষ্কৃতি নেই—নরকাভিসারের এইগুলিই হচ্ছে এক একটি তোরণ—এখানে যাত্রীকে একক্ যুদ্ধ করতেই হয়, এখানেই আলো যারা কেড়ে নিয়েছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ—অজগর ব্যক্তির সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যুদ্ধ—

He wrestled with powers that snatched from
mind its light....
He was alone with the grey python night.

কিন্তু এরই মধ্যে শবাসনবদ্ধ সাধককে ভয় ভীতি ভ্রান্তি লোভ মোহ কাটিয়ে রাত্রির অমানিশা পেরিয়ে যেতে হয়, উষার আলোর জন্য চেয়ে থাকতে হয়—জগন্মাতার, পরাপ্রকৃতির অবতরণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়, অনাগারিক হতে হয়. অবৈর হতে হয়, প্রেমনিমজ্জিত হতে হয়—নানারূপে সেই অনন্তের সাধনা, সেই অসীমকে পাওয়া, নেতিকে দূর করে ইতিতে আসা—তামসী রাত্রির বুকে, নরকের গভীরতম গহ্বরে সেই পরম মাণিক্যেরই ছটা।

শ্রীঅরবিন্দ আর একটি মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন—সুখ নেই, শান্তি নেই, জীবনে তৃপ্তি নেই, ভোগের মাধুর্য নেই, ত্যাগের দীপ্তি নেই, একটা ক্লান্তি একটা শান্তি, একটা অসহ বেদনা বোধ আসে, যাকে তিনি বলেছেন—a torpor was the sole rest of agony followed by a worse agony, তখন মনে হয়, যদি বিলুপ্তি আসে, দীপনির্বাণ হয়, তবেই বুঝি সব বেদনা নির্বাপিত হবে, দুঃখ তনহা সবের নিরোধ হবে—If one would cease to be, all would be all—তা নয়, অরবিন্দদর্শন আরো এগিয়ে এলো সেই ভূমানন্দের দিকে, সচ্চিদানন্দের আর এক প্রকাশময় ঐশ্বর্যের দিকে, যেখানে পূর্ণ প্রকটিত হবে Quivering ecstasy বা অতীন্দ্রী আনন্দ বোধে। তিনি যে আত্মদা, বলদা, মৃত্যু আর অমৃত যে একেরই ছায়া। 'সাবিত্রী' তারই বিশ্ববোধ, সেই নবতমা প্রত্যুষার বৃহত্তম ছায়া।

এইখানে শ্রীঅরবিন্দ একটি বিশ্বজনীন (cosmic) সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন স্বর্গের রাস্তা হ'ল নরক, স্বর্গে পৌঁছতে হলে নরকের মধ্য দিয়ে যেতেই হবে এই হলো সৃষ্টির চিরন্তন ব্যবস্থা—None can reach heaven who has not passed through hell. এই নরক

পুরাণের বা দান্তের নরকের চেয়েও ভীষণ। কারণ এই নরক চেতনার নরক। আলো এখানে নেই, শুধু অন্ধকার, শুধু হাহাকার।

আমরা দেখেছি যে মানবাত্মার প্রতীক অশ্বপতিকে তাঁর অনন্ত যাত্রার পথে যুধিষ্ঠিরের মতো নরকের দ্বারে আসতে হয়েছিল, সেই নিম্নের রাজ্যকে অতিক্রান্ত করতে হয়েছিল, সেখানে অজ্ঞান, অন্ধকার, সেখানে তিমিরনিবিড় অমা রাত্রি, সংশয় সন্দেহ মৃত্যুর খর ও মর সীমা। সেইখানে মনের চেতনার মধ্যেই নরকের প্রতিষ্ঠা, আমার কর্ম, আমার ধর্ম, আমার জ্ঞান, কিন্তু ঋষির অনুভূতিতে আসে মৃত্যুও যাঁর ছায়া, অমৃতও যে তাঁরই ছায়া—তিনি যে আত্মদা, বলদা।

আপনারে দেন যিনি, সদা যিনি দিতেছেন বল
বিশ্ব যারে পূজা করে পূজে যারে দেবতা সকল
অমৃত যাঁহার ছায়া, ছায়া যার মহান মরণ
সেই কোন্ দেবতারে হবি মোরা করি সমর্পণ

কস্মৈ দেবায়—জিজ্ঞাসার মন্ত্ররূপে যার সূচনা, তারই পরিণতি তস্মৈ দেবায়—তুমিই তুমি, সব নিয়ে তুমি, অহং নিয়ে, মিথ্যা নিয়ে, অজ্ঞান নিয়ে।

সুহ বা সুহ বা, সুহ বা সুহ
তিনিই তিনি, তিনিই তিনি

আলো আর কালো, পাপ আর পুণ্য, সুকৃতি আর দুষ্কৃতি সবই সেই বৃহত্তর মহত্তম জীবনের দ্বার। শুধু—

আধেক দুয়ার খোলা

চলবে না।

খুলতে হবে সব টুকু, যেতে হবে সব পথ, 'হতে' হবে সর্বভাবে, সর্বরূপে, সর্ব জ্ঞানে-ধ্যানে-চেতনায়, মৃন্ময় থেকে তন্ময় হয়ে চিন্ময়ত্বে। শুধু বদলে নেওয়া—আসলে নেতিত্ব আর ইতিত্ব সেই একেরই এপিঠ ওপিঠ, তার আভাস আর তার বিভাস।
তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন,

Knew death for a cellar of the house of life. মৃত্যুই হলো জীবনের উত্তরণের পথে একটি বিরাম গুহা, একটি নিভৃত কক্ষ।

Hell as a short cut to heaven's gates নরকই হলো স্বর্গে পৌঁছাবার তাড়াতাড়ি পথ। অবশ্য আমাদের শাস্ত্রে বলে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি শত্রু ভাবে ভজনা করেই ভগবান্‌কে পেয়েছিলেন তাড়াতাড়ি। তার অর্থ হয়তো অন্য, কিন্তু তার মূল কথা হচেচ যে "মন্মনা" হওয়া, যেরকম ভাবেই হোক্।

অশ্বপতি বেরিয়ে এলেন রাত্রির ঘনান্ধকার থেকে, মহাপ্রকৃতির বিরাট্ আদিম গর্ভ থেকে (Nature's titan embryo) সূর্যালোকিত পথে (Sunlit path)। ফিরে এসে তিনি জানতে পারলেন যে জৈব চেতনায় পদে পদে কত বাধা। ছিন্নভিন্ন জনপদ (Cities uprooted), মৃত্যুক্লিন্ন মানুষ, আহত নিহত নির্যাতিত জনগণ, সবই তো সেই অজ্ঞান তিমিরান্ধ রাত্রির কাজ, জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তার চক্ষু উন্মীলিত হয়নি।

Night the Eternal's shadow veil
Knew death for a cellar of the house of life.
In destruction felt creation's hasty pace.
And hell as a short cut to heaven's gates.

রাত্রি হচেচ সেই জ্যোতির্ময় সনাতনের 'ঘুমতী' ঘোমটা, ছদ্ম আবরণ—মৃত্যু জীবনেরই একটি ভঙ্গি—এ সেই ঋষিদেরই কথার পুনরাবৃত্তি

ভয়াত্তপতি সূর্যঃ, ভয়াদিন্দ্রশ্চ বরুণশ্চ . . . .

মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ

মৃত্যু থামায় না, মৃত্যু থামে না—মৃত্যু চলে, সঞ্চরমাণ কালের ক্লান্তি দূর করে—আমরা সবাই অমর যোগী।

কিন্তু যাত্রার শেষ নেই, চলার বিরাম নেই, এই জগতে—শুধু স্থূলের জগতে নয়, সূক্ষ্মের জগতে ও প্রাণের স্পন্দনে যে জগৎ, মনের ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে যে জগৎ, মনের অতীত যে জগৎ, সবই চলেছে। যেন পর্দার পর পর্দা উঠছে, ছবির পর ছবি। জীবনদেবতাদের স্বর্গে

(The Paradise of the Life Gods) যখন অশ্বপতি পৌঁছলেন তখন তাঁর এইটুকু লাভ হয়েছে যে খণ্ডতা বোধ আর নেই (Division Ceased to be), জীব ও আত্মা এক হয়ে গেছে (Matter and spirit mingled and were one)। যদিও The Highest has not been reached অর্থাৎ তুঙ্গীনাথের শীর্ষে মানব-মন পৌঁছায়নি তবু সেই তুঙ্গাভিলাষী সত্তা অমেয় শুভ্রতার রাজ্যে পৌঁছেছে। কিন্তু সেই চিরন্তন প্রশ্ন এখনও অর্থাৎ এক না দুই—জীব না শিব, দ্বৈত না অদ্বৈত 'মমৈবাংশ' না 'সর্বং খল্বিদং'। 'Lights on Yoga' এ শ্রীঅরবিন্দ বললেন—The incompetent pride of man's mind makes a sharp distinction and wants to call all else untruth and leap at once to the highest truth ;—Whatever it may be—but this is an ambitious and arrogant error—মানুষের অহংকারই এই ভ্রান্তিতে নিয়ে যায়। সেই অহংকারের—এক ধরনের প্রকাশ হচে দীনতাবোধ, সত্যময়, প্রেমময়, জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে identification বা সাযুজ্য নেই, একটা দাসসুলভ মনোভাব শুধু আছে, যেন আমি অতি দীন, অতি হীন, অতি তুচ্ছ—শুধুই বলা যে, হে ঠাকুর আমি তাপী পাপী, আমি দুর্বল, আমি মোহগ্রস্ত, আমায় ক্ষমা কর, আমায় কৃপা কর—বিবেকানন্দ বলতেন যে, এই ধরনের মানুষদের আত্মজ্ঞান নেই, আত্মন্‌কে তারা জানে না, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ নয়, তারা প্রবুদ্ধ প্রবক্তা নয় ; শরণ নিতে পারে কে, না যে শরণ দিতে পারে। অবশ্য এই স্তরে এসে পৌঁছলেও সাধকের কিছু প্রাপ্তি যে হয় না তা নয়। কবি শ্রীঅরবিন্দের বর্ণনায় আমরা পাচ্ছি যে এই স্তরে সাধারণত: কি কি প্রাপ্তি হয়—

প্রথম—অনন্তের আনন্দাভিসারের একটু দ্যুতি (a lustre of some rapturous Infinite)

দ্বিতীয়—তাঁরা দিব্যমদিরা পানে উন্মত্ততা, পীত্বা পীত্বা পুন: পীত্বা (Intoxicated with the wine of God)

তৃতীয়—তাঁরা একটা দিব্য দ্যুতিতে উদ্ভাসিত শুধু নন্ নিমগ্ন (Immersed in Light)

চতুর্থত:—তাঁরা তখন সর্বসময়েই দিব্যাবস্থায় থাকেন (perpetually divine)

অর্থাৎ তাঁদের তখন জ্ঞান এসেছে, শক্তি এসেছে, আনন্দ এসেছে—এই ত্রিধারায় স্নান করে তাঁরা প্রেমরাধার বুকে শুয়ে আছেন।

Lay on the breast of Universal love. বৈষ্ণবী পরিভাষায় সর্বত্র সমতা দেখেই অনন্ত মমতার উৎপত্তি। একে এক ধরনের তুরীয় অবস্থা বলা যায়, যার আনন্দক্ষণভেদনের অপূর্ব সম্ভাবনা, যে শক্তিকে এখনও কাজে লাগানো হয়নি (untried capacity for bliss)।

এ যেন প্রেমের ছদ্মবেশে স্বয়ং অনন্তদেব হাজির (Eternity drew close disguised as love)।

এই বিলাসের শেষ নেই, এই নিত্য রসের সমাপ্তি নেই, অগ্নি-ব্যঞ্জনায় দীপ্ত, সাগরতরঙ্গের মতো উৎক্ষিপ্ত (A fire ocean of felicity)

জীবনকে এগিয়ে দেয়, কালের সীমাকে অতিক্রম করে।

সাবিত্রীর দ্বিতীয় সর্গের একাদশ পর্বে যখন পৌঁছলাম তখন বৃহত্তর মানসের রাজ্যদের ও তাদের অধিদেবতাদের কথা বলছেন কবি। সেটা সাধনার শেষ স্তর হলেও সৃষ্টির শেষ কথা নয়—

তিনি পৌঁছেছেন এমন এক স্তরে যখন শ্রীঅরবিন্দের অপরূপ চেতনায় ভাসছে—

Where thought leaned on a Vision beyond Thought
And shaped a world from the Unthinkable

যখন মানুষী চেতনা এক অচিন্তনীয় রূপরসধৃতিমেধামায়াকে ধরে ফেলেছে এবং তারই উপাদানে গড়ছে এক নতুন জগৎ, সেখানে আছে।

The splendours of the Ideal Mind

আদর্শমন যা কিছু বৃহৎ মহৎ বৃহত্তম মহত্তমকে কল্পনা করতে চায় তারই স্থির বিদ্যুতের মত স্নিগ্ধ বিভাস,

Instinct with endless more that we must be

আরো অনেক কিছুর, অশেষ কিছুর সম্ভাবনা যা আমাদের হতে হবে। শুধু আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ নয়—এ সব স্বাভাবিক

জ্ঞানবল ক্রিয়াকে পেরিয়ে আর এক উচচকোটির আনন্দের জগৎ, আলোর জগৎ, সত্যের জগৎ তৈয়ারী করবে মানুষ, এই অমেয় আশাই শ্রীঅরবিন্দের—সাবিত্রীর মাধ্যমে তাই ব্যক্ত হয়েছে অভীপ্সার প্রতীক রূপে। ব্যক্তিগত চেতনায়, যোগের সিদ্ধিতে, নিষ্ঠায়, তপস্যায় মানুষ স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে অরূপরতনের অপরূপত্বের মহিমায় পৌঁছায় এ কথা সত্য, সামীপ্য-সাযুজ্যও হয়তো লাভ করে—অজ্ঞান বন্ধন টুটে যায়, ঘন অন্ধকারের পর্বে পর্বে মহাতামসী নিজ হাতে দীপশিখা জ্বালিয়ে দেন। কিন্তু চেতনার সেই মুক্তিই শ্রীঅরবিন্দের কাছে শেষ কথা নয়। বিশ্ব ও বিশ্বাতীত দুই এক ভূমানন্দে মিশে সাধকের বোধিভূত হবে এবং সেই চেতনা উত্তরণের পর অবতরণ করে মর্ত্যকায়ায় আবার সব রাঙিয়ে দেবে, জরিয়ে দেবে, 'সোনা' হয়ে যাবে. আলোয় আলো—এই তো শ্রীঅরবিন্দের সর্বোত্তম কল্পনা। নর ও নরোত্তম শুধু নয়, বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে সেই পরমের স্পর্শ পড়বে, সেই নারায়ণ আবির্ভূত হবেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, কেন এই আবরণ, কেন এই অন্ধকার, কেন সেই পরম জ্যোতির্ময় পরাৎপরের ছদ্মবেশ, যিনি সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাস, অথচ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত. তিনি পূর্ণজ্ঞান. পূর্ণশক্তি, পূর্ণপ্রেম, তিনি এই খণ্ড চেতনার আস্তরণে নিজেকে আবদ্ধ করেন কেন? এই প্রশ্নের নানাভাবে নানা উত্তর দিয়েছেন সাধকরা—কেউ বলেছেন মায়া, কেউ বলেছেন পঞ্চভূতের ফাঁদ, কেউ বলেছেন লীলা, কেউ বলেছেন, যখন পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিষ্যতে. শূন্য থেকে শূন্য বাদ দিলে শূন্যই থাকে, তখনও মাভৈঃ—কেউ বললেন যিনি দ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষ— তিনি এই সব সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ. জরা-ব্যাধির অতীত পুরুষ, তিনি অটল, অচল, অক্ষর সনাতন নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।

শ্রীঅরবিন্দ এই সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন এই বলে যে ব্রহ্মের রূপই হচ্চে unity and multiplicity—তিনি এক এবং বহু, তিনি দূরে তিনি অন্তিকে, তিনি গতিশীল তিনি স্থাণু। অজ্ঞানতা হলো নিজেকে বাঁধা। আসলে নিজেকে বাঁধা যায় না—যশোদা পারেননি বাঁধতে শ্রীকৃষ্ণকে, দড়িতে কুলোয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, খণ্ড জ্ঞানের চেতনা যাঁরা নিয়ে আসেন তাঁরা হচেছন অন্ধকারের শক্তি বা Force of darkness, এঁরা হচেচন

Invisible বা অদৃশ্য। দেবাসুরের যুদ্ধের কথা আমরা বারে বারে পড়ি। মধুকৈটভ মহিষাসুর শুম্ভনিশুম্ভকে মহাশক্তি বারে বারে হনন করছেন্

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
অহং ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ
অহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ

এই শক্তির কাছেই মানুষ নিজেকে নিবেদিত করে দিতে চায়। শ্রীঅরবিন্দ একেই বলেছেন "The Mother". সেই শক্তি রূপাতীতা, আবার রূপমোহিনী। সেই মাকেই বন্দনা জানাই—বন্দে মাতরম্।

———

একাদশ উল্লাস

আমাদেরই দেশের এক যোগভ্রষ্ট কিশোর কবি একদিন কল্পনা করেছিলেন—

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান
সহসা আনন্দসিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া
আদিদেব খুলিলা নয়ান।

যার ফলে বাঙ্ময় হয়ে উঠল জগৎ, চারিমুখে বাহিরিলা বাণী—শব্দব্রহ্ম অধিষ্ঠান হলেন—ধ্বনি, ধ্বনি—নাদ—আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায় সঞ্চারিতে লাগিল সে ভাষা। তারপর

জগতের গঙ্গোত্রীশিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর
স্তব্ধতার পাষাণ হৃদয়

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে এবং উচ্ছ্বাসে বিশ্ব যেন উন্মাদ হয়ে উঠল প্রতিটি অণুতে, তখন সৃষ্টিকে নিয়মের মধ্যে (unified law) পুরে দিলেন বিশ্ববিধান কর্তারা।

মহাছন্দে বন্দী হল যুগ যুগ-যুগান্তর

কিন্তু এই নিগড় বাঁধা আর্তপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল, বিলাপ উঠল আকাশে বাতাসে—

জাগো জাগো জাগো মহাদেব।

জগতের মহাচিতানলে প্রলয়ী নটরাজ সব ধ্বংস করে দিলেন, ত্রিকাল ব্যেপে ত্রিকায়ের এই আবর্তন বিবর্তন পরিবর্তন চলছে—সৃষ্টি স্থিতি সংহারের এই ত্র্যম্বক রূপ। তবু এই ছোট্ট পৃথিবীর ছোট্ট মানুষ, সেই

হ'ল বিদ্রোহী, সে বললে, আমি রণশ্রান্ত পথিক—আমি চলেছি, আমি জানতে চাই শুধু এই ছন্দকে—তার পিছনে যে পরাশক্তি আছে তাকে—প্রকাশময় এই জগৎকে। জানি, এখানে অস্থৈর্যের হাওয়া আছে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

A quivering trepidant uncertain world.

কিন্তু মানুষ হচ্ছে—

Insatiate seeker, he has to learn.

তার জ্ঞানপিপাসা অদম্য, সে জানতে চায় সবকিছু। সাধনার একস্তরে উঠলে জীবন অন্তর্মুখী হয়, তখন বহিরঙ্গের কর্ম আর তাকে টানে না, অন্তরঙ্গ হয়ে রসাস্বাদনে তার মন উন্মুখ—

He has exhausted now life's surface acts

তখন

In him Matter wakes from its long obscure trance
In him Earth feels the God head drawing near

মানবসত্তার ক্রমাভিব্যক্তির মাঝখানে তার মধ্য দিয়েই জড়ের জাগৃতি, কল্প কল্পান্তের পাষাণী অহল্যার তমোনিদ্রা থেকে সে জেগে উঠেছে—সামনে তার অনাদি অনন্ত পথ, ভগবৎসত্তার দিকে চলার—সে পথ শুধু জ্যোতির্ময় কুসুমাস্তীর্ণ নয়—সে পথ উঁচু নীচু; তবু তার যাত্রার সীমা নেই—অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞ-হুতাগ্নি থেকে সে বেরিয়ে এসেছে—সংখ্যা-গণনার অতীতলোকে—তার চক্রতীর্থের পথে পথে শত শত ভাঙাগড়া, ওঠাপড়ার ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ। জড় জেগে উঠলেই দেখা যায় যে, তার স্থূল আবরণের পিছনে আছে আরো আরো সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রলেপ—যেন পেঁয়াজের খোসা—এক একটি কোষ। তাই মানুষের অগ্রগতির পথে কত বহিরাবরণের উন্মোচন হয়। সে বুঝতে পারে—সে শুধু অমৃতের পুত্র নয়, নিজেই অমৃত, অমিতবিত্ত, অমেয়—

Infinity put on a finite soul.
সীমার মাঝেই অসীমের স্ফুরণ।
A time—made body housed the illimitant,
যিনি অমেয় তাকেই 'মিত' করে দেখা—

তাই যখন চেতনাতে সূক্ষ্ম জড়ের রাজ্যের খবর পাই (The kingdom of subtle Matter) তখনই সন্ধান পাই এমন একটি জীবনের, যা মেদমজ্জা রক্ত স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যেও তার অতীত একটা সত্তার সন্ধান দেয়—এমন একটি আলোর, যাতে সব কিছু দেখা যায়--

A life that lived not by the flesh
A light that made visible immaterial things,

মানুষের মধ্যে যে এই বোধ সুপ্ত আছে তার প্রমাণ তো পদে পদে—কেন অপরজনের দুঃখ দেখে আমি বিগলিত হই, মমতা আসে, কেন সুন্দর জিনিস দেখলে আমার মনে রসানুভূতি হয়, কেন আমার মধ্যে বিচারবুদ্ধি জাগ্রত, কেন আমি বস্তু নিরপেক্ষ হয়েও ভালোবাসি, কেন আমি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সংস্কার ভুলে গিয়ে ত্যাগ করি, সেবা করি, আত্মদান করি।

কারণ আমার সত্তায় বীজ রূপে আছেন বিশ্বসত্তা, সকল জড়ের মধ্যেই সুপ্ত বিকাশহীন অবস্থায় যিনি থাকেন—মানুষের মধ্যে তিনি সবে প্রকাশ পাচ্ছেন। একেই শ্রীঅরবিন্দ বললেন—Plunge into the night.

This fallen world became a nurse of Soul
Inhabited by concealed divinity.

এই যে পতিত অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী, এরই মধ্যে অন্ধকারে বসে আছেন তিনি—তাঁকেই খুঁজে পেতে হবে, অণুতে রেণুতে তাঁর স্পর্শকে জাগিয়ে তুলতে হবে—

This is the destiny bequeathed to her.
এই হচ্ছে অক্ষয় অব্যয় পরিণাম।

বাইরে থেকে দেখে, গণনা করে, ইতিহাস আওড়ে, ফর্মুলা বা চার্টে ফেলে এই ব্যবহারের জগৎকে বোঝা যায় না—তা তিনি কবিই

হোন, মনীষীই হোন, বিজ্ঞানীই হোন বা দার্শনিকই হোন—সে দৃষ্টি সত্য, কিন্তু সত্যতর নয়, সত্যতম নয়; খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন অনির্বাণ নয়। অর্থাৎ প্রকৃতি (Nature)কে বাদ দিয়ে চলে, কিন্তু প্রকৃতির চশমা দিয়ে (Nature's glass) সব কিছু দেখার শেষ হয় না। একটি উদাহরণ দিই—সকালে উঠে অন্ধকারের পারে তমসার অন্তরালে আদিত্যবর্ণ এক জ্যোতির্ময় সত্তাকে আমি দেখলুম—যিনি আস্তে আস্তে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন—সপ্তাশ্ববাহিত সবিতা—সেই বরেণ্য তেজ আমার ইন্দ্রিয়দত্ত চোখে সোজা দেখা যায়, তার আলো, তার উত্তাপ, তার তমোহরণ গুণ, আমি অনুভব করতে পারি। এটা সত্য দৃষ্টি, সত্যতর দৃষ্টি—সূর্যের আলোতে পৃথিবীর সব কিছু দেখা, সত্যতম দৃষ্টি হচ্ছে সূর্যের তেজেতে তেজস্ক্রিয় জেনে সব পদার্থকেই সূর্যসম্ভব বলে জানা। প্রাকৃতিক স্থূল জগতে যা সত্য, মনের সূক্ষ্ম জগতেও তা সত্য। আধ্যাত্মিক জগতেও সেই একই নিয়ম।

পূর্বেই বলেছি, ঋষি, কবি, দার্শনিক, যোগী, শ্রীঅরবিন্দ এই অপূর্ব সত্যটিকে পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন—জড়ের এই যে জাগরণ, অণুর এই যে আলোড়ন—এই তো দিব্যের জাগরণ—দিব্য বা Divine স্বর্গের সিংহাসনে বসে সুপ্রীমকোর্টের কোন মহা বিচারপতি নন্। তিনি আমাদের সত্তার বাইরের মহতী দেবতা নন্—তিনি প্রকাশময় এই জগতে প্রকাশিত হচ্ছেন প্রতিটি অণুতে রেণুতে, মাটিতে, মানুষে।

Alive with her yearning woke the inert cell
In the heart she kindled a fire of passion
and need,

এই তো মুক্তির স্পৃহা, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা, প্রকাশিত হবার আগ্রহ, নতুন করে মিশে যাবার চাঞ্চল্য, কবির ভাষায়—

তুমি নব নবরূপে এসো প্রাণে।

—নবনবোন্মেষশালিনী হয়ে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষায় এই হচ্ছে 'এভলিউশন' বা ক্রমাভিব্যক্তি, গণ্ডির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবার

এই যে প্রয়াস, এই যে বিক্ষেপ, এই যে বিস্তার—সান্তের অনন্ত হবার চেষ্টা। এ যেন একটা খেলা বা লীলা—যা ছিল অনন্ত, যা ছিল অমেয়, যা ছিল অসীম—সেটি রূপে, দেহে, বিগ্রহে, বীজে সীমার মধ্যে বদ্ধ হলো, অব্যক্ত থেকে ব্যক্তে এলো, তারই চেষ্টা হলো (সজ্ঞানে হোক নির্জ্ঞানে হোক) গণ্ডি কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া, নতুন রূপে, নতুন অভি-ব্যক্তিতে সীমা ছাড়িয়ে চলে যাওয়া। যুগ যুগ ধরে কল্প থেকে কল্পান্তে মহাপ্রকৃতির এই খেলা চলছে—ভাঙাগড়া, যোগবিয়োগ, বিপর্যয় বিশ্লেষণ। অঙ্কের পর অঙ্ক শেষ হচ্ছে, যবনিকা উঠছে পড়ছে, কিন্তু নাট্যের অবসান নেই। মানুষই হচ্ছে সেই জীব, যে ক্রমাভিব্যক্তির এমন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, যার প্রতিটি অণুতে, চেতনায় রয়েছে সীমার বন্ধন অথচ অসীমের কল্পনা, যে নিজে বদ্ধ তবু স্বপ্ন দেখে অবারিত মুক্তির। সেইজন্য তার দৈহিক, মানসিক, জৈবিক, আধিভৌতিক—সব কাজেই লেগে থাকে এই দুয়ের পরশ। সে পশু, স্থূলের যূপকাষ্ঠে বদ্ধ, আবার সে ভোগতৃষ্ণা মিটিয়েও আর কিছু তৃষ্ণার জল সে চায়—তাই সে সুদূরের পিয়াসী—অন্তরেও সে তিয়াসী।

শ্রীঅরবিন্দ এই সমস্যার একটা সমাধান এনে দিলেন আমাদের সামনে। ক্রম বিবর্তন হচ্ছে প্রকৃতির রূপ—সুদূর মহা অতীত থেকে এ্যামিবার পূর্ব পুরুষরা আজ মহামানবে পরিণত—মহাপ্রকৃতি তার খেলাঘরে বসে মৃৎপুত্তলিকা গড়ে চলেছেন, কিন্তু পছন্দ আর হচ্ছে না, রূপের অন্তর দেশ থেকে অপরূপের পুরে যাচ্ছে না।

> **Matter dissatisfies, She turns to mind**
> **She Conquers earth, her field, then claims the Heaven.**

জড়ের উপাদানে খেলা ভালো জমল না—প্রকৃতি তখন 'মন'কে নিয়ে পড়লেন—মানুষ হলো সেই মনস্বী জীব, সে হয়ে উঠলো তপস্বী, উদাসী—আবার সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো—ভোগযোগ একত্রই ধর্ম—ত্যাগের দ্বারাও ভোগ করা যায়। তখন মহাপ্রকৃতির অভিব্যক্তির স্তরে দেখা গেল যে, পৃথ্বীসত্তাকে জয় করতে পারলেই চেতনার শেষ কথা বলা হয় না—চেতনার মুক্তি শুধু নয় তার ব্যাপ্তি ও সাম্যও যে

চাই—স্বর্গ সত্তাকে নামিয়ে এনে, নিজের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—প্রকৃতির বিবর্তনের ইতিহাসে এই এক পরম উল্লাস।

'দিয়েছো আমার পরে ভার তোমার স্বর্গটি রচিবার'—বদ্ধ আত্মাকে শুধু Jail delivery করলেই হবে না, তাকে সুন্দর ও শোভন করে স্বাধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ শুধু দার্শনিক, কবি, মহাযোগী নন্, তিনি ঐতিহাসিক বিবর্তনেও বিশ্বাসী, তাই তাঁর কল্পনায় এলো, সৃষ্টির প্রথমযুগে—প্রকৃতির নির্মাণকক্ষে জড় জগতের মালমশলা নিয়ে মানুষের সৃজন যখন হচ্ছে, তখন প্রকৃতির স্বরূপ কি—

The graceless squalor of her beast desires,
The staring visage of her ignorance
The naked body of her poverty
Here she first crawled out of her cabin of mud.

মানুষেই জড় প্রকৃতি তার মৃত্তিকার ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুলো—তার চতুর্দিকে পাশবপ্রবৃত্তির রুচিহীন অশুচি ক্লেদ, অজ্ঞানতার তাকিয়ে থাকা দৃষ্টি, দারিদ্রের নগ্নতম বিকাশ। তখন

The gusts of Nature were the only law
Force wrestled with force but no result remained
Sense pleasures and sense pangs soon caught,
soon lost
And the brute motion of unthinking lives.

অন্ধ প্রকৃতির নির্দেশই ছিল একমাত্র নিয়ম, শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘর্ষেই হতো তার বিচার, কিন্তু মা ফলেষু কদাচন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়েই হতো সব কিছুর আস্বাদন, সেই মানদণ্ডেই নির্ণীত হতো সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বেদনা, তার আরতি ও বিরতি। মননহীন জীবনে জান্তব আলোড়নই ছিল একমাত্র মাপকাটি। তখন প্রশ্ন উঠতে বাধ্য—আছে কি কোন পরম কারুণিক মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তা? দরকার আছে এই ধরনের মদমত্ত পৃথিবীর কৃমিকীটদের—এ সত্য নয়, সত্য হতে পারে না,

মিথ্যা এ জগৎ, এ হচেছ্‌ মায়া, মরীচিকা, অণুপরমাণুর আক্ষেপ—বিক্ষেপে যোগ বিয়োগের (Permutation—Combination) ফল।

শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতির রহস্যকে বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের দৃষ্টিতে ধরে, মহাযোগীর সংস্কারে পূত করে বললেন—

এ পৃথিবী মিথ্যা নয়, অপ্রয়োজনীয় নয়—এ হচেচ
Awaiting some tremendous dawn of God.

আছে উদ্দেশ্য আছে, পন্থা আছে, পরিমাপ আছে, সেই আত্মস্থ স্বস্থ মানুষের গভীরতম দৃষ্টিতে প্রতিভাত হলো কবিকল্পনার মতো, অথচ সূর্যের মতো ভাস্বর হয়ে যে মহাকাল তপস্যায় বসেছেন,—তার প্রাথমিক রূপে, নতুন প্রভাত আসবে, নতুন আলোক, নবসৃষ্টি আনবে নূতন ধরনের জাগরণ—অতীতকে বাদ দিয়ে নয়,—সবই অভিব্যক্তির যোগজ সূত্রে বাঁধা—সবকিছুকে রূপান্তরিত করে নিয়ে—আত্মকাম হয়ে, বীতকাম হয়ে। এই আলোক যজ্ঞের হোতাই মানুষ—সে নিজে উর্ধ্বের যাত্রী, পৃথিবীর সব কিছু অণুপরমাণু-জড়-অজড় সব এক জ্যোতির্ময় বিভাসে পরিণত হবে—তাই অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এক হয়েছে ঋষির কল্পনায়, কবির স্বপ্নে, সাধকের ইঙ্গিতে। সে ফিরে পাবে তার হ্লাদিনীকে, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে—A shapeless memory lingers in us still—আছে, সে ধ্রুবা স্মৃতি,—মানুষ শুধু মৃত্যুকীর্ণ ক্ষুদ্রতা (A death bound littleness) নয় সে বিরাট, সে মহৎ, সে বৃহৎ। সে চেয়ে আছে উর্ধ্বতন তুঙ্গ শিখরের দিকে (submit selves).

আমাদের মর্ত্য জীবনের ভাব ভালোবাসা, কাম কামনা—সবই সেই অনন্তের তরঙ্গ, তারই প্রকাশ। ভোগের উপকরণের যেমন বহু রূপ, তেমনি তার ভোগের প্রক্রিয়ারও নানা ছন্দ—সে শুধু ইন্দ্রিয় দিয়েই ভোগ করে না—মন দিয়েও করে—অবশ্য মনকে আমরা ষড়িন্দ্রিয় বলি। প্রকৃতির জড়-জীবনের ইতিহাসে 'মনের' আগমন ও তারই আধার হিসাবে। "ব্রেনে"র বিবর্তন, মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক বিচিত্র বিজ্ঞান। আজকের স্বপ্নসাধক কল্পনা করছেন যে 'মানুষ প্রতীকে' 'মন'কে নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রকৃতির বীক্ষণশালায় হলো, এখন সেই মশলা (material)-কে সম্বল করে 'মন'কে অতিক্রম করে অন্য কোন বিরাটতর অভিব্যক্তিতে

যাওয়া শুধু অসম্ভব ত নয়ই, সাধ্যও। তারই অলিখিত ইতিহাস, তারই দ্যোতনাব্যঞ্জনা ব্যক্ত করলেন কবি-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ। আমার অস্তিত্বের পরিধি বাড়াতে চাই, আমার আস্বাদনের ক্ষেত্রকে—মানুষ নিঃসঙ্গ হতে পারে না, সে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়, নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়, নিজেকে বিস্ফারণ, বিদ্রাবণ করতে চায়—এই তার হওয়ার প্রথম প্রীতি, প্রথম কান্না—আমি চাই, আমায় দাও—আমমাংস দাও, শাণিত কুঠার দাও, গুহাভ্যন্তরে বাসস্থান দাও, ভোগ্যা স্ত্রী দাও, অন্ন দাও, গাভী দাও,—শালী তণ্ডুল দাও—তার পরে আরো সূক্ষ্ম হল—

রূপং দেহি জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি

আরো সূক্ষ্মতর হল, যখন সে বললে—নাও, নাও আমার সব নাও—আমি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করব

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্

শুধু তুমি দেখা দাও, দেখা দাও—নয়নপথগামী হও—এও কান্না—কিন্তু এ কান্নার সঙ্গে প্রথম কান্নার বিভেদ হচ্ছে—এ শুধু দেহের অভাব বোধের জন্য কান্না নয়, মনের অভাব বোধের জন্যও কান্না। অভিব্যক্তির দ্বিতীয় পাদে পৌঁচেছি —মানুষ চিন্তা করবার শক্তি পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মারণাস্ত্রও এসেছে—সে কল্পনা করছে, সে স্বপ্ন দেখেছে। তার ফলে হচ্ছে অনেক সময়ে অন্তরতম নিভৃতে যে মনোময়ের আভাস সে পেয়েছে তিনি চাপা পড়ে যাচ্ছেন পাষাণবেদীর পাদপীঠে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য কী যে মানুষ শুধু প্রাণময়, রসময়, ভোগময় হবে? না—আরো ঊর্ধ্বে উঠবে, আরো বিচিত্র হবে, সম্ভাবনাময় হবে—তাই তার প্রাথমিক মনকে নতুন করে গড়বার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হলো। কামনার শতশাণিত আঘাত, তার তরঙ্গভঙ্গ, তার গুঞ্জন অভিনন্দন, অবচেতন ইচ্ছার তীব্র স্ফূরণ, ক্ষুধার তাড়না,—এই যে ফুটন্ত অগ্নি-কুণ্ড—এরি মাঝে সে পেলে আলোর একটু প্রসাদ—

কোথায় আলো, কোথায় আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো, তারই মধ্যে একটি ক্ষীণ রেখায় যেন সে বুঝতে পারে এই বিশ্বপ্রকৃতির জীবনের

ছন্দ কিসে গড়া, কি তার নিয়ম, কেন? কেন? কেন? কোথায় সে আম্মদা, কে সে বলদা—কস্মৈ দেবায়—তখনই সে বুঝতে পারে—

সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি মহাকাল আছে জাগি।

রবীন্দ্রনাথ একদিন গেয়েছিলেন—

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারিদিকে
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুরগ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়,
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই
যেন এ দুখ অন্তহীন
ঘরছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন।

কিন্তু সত্যই কি এই পৃথিবীতে যাওয়া-আসা, চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরা প্রকৃতির মননহীন আলোড়ন ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য নেই? যুগ যুগ ধরে জ্ঞানী ধ্যানী চিন্তাশীল মানুষেরা বুঝতে চেয়েছে, জানতে চেয়েছে—কেন? কী? কোথায়? ঋষির ধ্যানে, মানবসত্তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, প্রতিভাত হলো একটি বৃহত্তর সত্য—না, না, এই পৃথিবী, এই জীবন, এই জন্মমৃত্যুর আলোড়ন মিথ্যা নয়, অপ্রয়োজনীয় নয়—এক অপরূপ প্রত্যুত্তরের সে 'প্রত্যাশায়' বসে।

আত্মস্থ স্বস্থ মানুষ দেখতে পেলে, এই জীবনের মূল্য আছে
He saw the purpose in the works of time.

কালের সীমানা পেরিয়ে মহাকাল রয়েছেন জেগে' অতন্দ্র হয়ে। একটা বিরাট আলোক যজ্ঞের হোতা হবে মানুষ—মানুষ নিজে বদলাবে, পৃথিবী বদলাবে, অণু পরমাণু সব কিছু জ্যোতির্ময় বিভাসে রূপান্তরিত হবে। 'সাবিত্রীর' মাধ্যমে এই অপরূপ আশার বাণী, সংকল্পের কল্পনা জানালেন ত্রিকালজ্ঞ কবি শ্রীঅরবিন্দ—অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—এই তিন এক হয়ে গেছে তাঁর চিন্তায়, চেতনায়।

A touch of God's rapture in Creation's acts
A lost remembrance of felicity
Lurks still in the dumb roots of death and birth.

সৃষ্টির প্রতিটি ছন্দে, জন্মমৃত্যুর মূক মূল কেন্দ্রেও সেই দিব্য স্পর্শের আনন্দ লুকিয়ে আছে, থমকে থেমে আছে সেই হ্লাদিনীর হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি। একটা উর্ধ্বতর বিধান মেনে চলতে হবে প্রত্যেককে, দেহের প্রতিটি কোষ হবে অগ্নিময় প্রেমশিখা।

আমাদের সান্ত-জীবনের কাম-কামনা ভাব-ভালোবাসা, সবই সেই অনন্তের প্রকাশ। পুরুষের উচ্ছল রক্তে, রমণীর কামনাময়ী ধমনীতে সেই মহাপ্রকৃতিরই কাজ চলেছে—

The will to conquer and have, to seize and keep,
To enlarge life's room and scope and pleasure's range
To battle and overcome and make one's own
The hope to mix one's joy with other's joy
A yearning to possess and be possessed
To enjoy and be enjoyed, to feel, to live
Here was its early brief attempt to be.

জীবনের স্বরূপ প্রথমতঃ আত্মকেন্দ্রিক—একে বিশ্বকেন্দ্রে সম্প্রসারিত করাই হচ্ছে আত্মতর্পণ, আত্মত্যাগ, আত্মদান। মানুষ বলছে—আমি চাই, আমি ভোগ করতে চাই, সুখী হতে চাই, জোর করে আয়ত্তাধীনে আনতে চাই ভোগের উপকরণগুলিকে—জরিয়ে রসিয়ে জাগিয়ে আমি ভোগ করব—পঞ্চমকারই হোক্ বা অন্য উপচারই হোক্—আত্মতর্পণ, আত্মতুষ্টি—এতো আমার বিধিদত্ত প্রকৃতি—আমার শিরায় শিরায় রক্তের প্রতিটি অণুতে, স্রোতে আমার এই কামনার লহর বইছে—এতে ন্যায়ও নেই, অন্যায়ও নেই। মূলে গেলে দেখা যাবে, এ হচ্ছে নিজের অস্তিত্বের পরিধিকে বাড়ানো—আস্বাদনের ক্ষেত্রকে, কারণ এই দেহের ক্ষেত্রপাল ভৈরব আমি নিজেই। তাইতো সংগ্রাম, তাইতো সংঘর্ষ, তাইতো নিজস্ব করে নেবার ব্যাকুলতা, কেড়ে নেবার প্রবৃত্তি। প্রকৃতির মাঝখানে মানুষ একা নয়, সে নিঃসঙ্গ নয়, সে নিঃসঙ্গ হতে চায় না, পারে না—তাই সে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়; শুধু প্রতি অঙ্গ তরে নয়—প্রতি দেহের সীমানা পেরিয়ে সত্তার গভীরে তার এই আকুতি—আমি শুধু আস্বাদন করবো না, আস্বাদিত হবো,—জীব শুধু শিব নয়, শিবও জীব—তাকে 'হতে' হবে। পথ দীর্ঘ, কিন্তু মায়ের ছেলে মায়ের ঘরে ফিরবেই। সমস্ত কামনা সমস্ত চেতনার মূলে এই অভিব্যক্তির প্রয়াস। আমায় 'হতে' হবে (Becoming)। প্রাচীন ঋষিদের চোখেও এই পরম সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল—আত্মতর্পণ থেকে তাঁরা বিশ্বতর্পণে যেতেন—আমাদের সাধারণ তর্পণ-মন্ত্রেই তা প্রতিভাত। প্রতিটি মানুষের তার জনকজননীর সঙ্গে অত্যন্ত স্থূল দেহজ সম্পর্ক, তাই সে সম্পর্ক আমরা জৈবিক ভাবে বুঝতে পারি—কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই গণ্ডিটিকে বাড়িয়ে নিতে পারলেই আমরা চেতনাকেও সম্প্রসারিত করে দিতে পারি—পিতা থেকে পিতামহ, আমার বংশ, আমার কুল—সপ্তদ্বীপনিবাসীরা আমার আত্মীয়—চেতনাকে আরো প্রসারিত করলেই দেখা যাবে আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্যন্ত যে জগৎ সব কিছুর সঙ্গেই আমি সম্পৃক্ত—আমার মূল সেইখানে—এ সত্য শুধু আধ্যাত্মিক সত্য নয়—বৈজ্ঞানিক সত্য। তাহলে আমার আত্মীয়তা সর্বস্তর ভেদ করে সর্বব্যাপী বিশ্বের প্রাণলীলার সঙ্গে, সেই চাঞ্চল্যের সঙ্গে, স্পন্দনের সঙ্গে, নাদের সঙ্গে, জ্যোতির সঙ্গে, যার মধ্যে হয়তো কিছু অচঞ্চলের স্থিতি আছে।

মানুষের কাছে প্রথমে আসে একটা অজ্ঞাত অনাহত সঙ্গীতির ক্ষীণ সুর যাকে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, The faint rhythms of a great unborn muse. তারপর তার জাগ্রত জীবনে এক অগ্নিময় হাওয়া এসে লাগে।

The strange creations of a thinking sense
Existences half real and half dream.

এটা হচ্ছে তার অভিব্যক্তির দ্বিতীয় পাদ—মানুষের চিন্তা করবার শক্তি আসছে, কল্পনা করবার, স্বপ্ন দেখতে শিখছে সে।

Patterns were built of love and joy and pain. জীবনে গড়ে উঠছে প্রেমের ছন্দ, আনন্দের সুর, দুঃখের বেদনা কিন্তু,

They worked for the body's wants, they craved no more. content to breathe, to feel, to sense, to act, identified with the spirit's outward shell. সেই দেহদেউলে যে দেবতা বসলেন, তিনি বহিরঙ্গেই প্রকাশ পেলেন—অন্তরতম নিভৃতিতে যে মনোময় বসে আসছেন তিনি চাপা পড়লেন পাষাণবেদীর পাদপীঠে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির তাতো উদ্দেশ্য নয়—মানুষ পশুত্বের বিবর্তন পেরিয়ে আরো প্রাণময় জ্ঞানময় মনোময় হয়ে উঠবে—এই হচ্ছে অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য।

A third creation now revealed its face
A mould of body's early mind was made.

—আর এক নতুন সৃষ্টির ছন্দ এলো। মানুষ তার তৃতীয় দান পেলে—প্রাথমিক মনকে নতুন করে গড়া হলো, তার জন্য ঊর্ধ্বের

এ শক্তি তার মনকে স্পর্শ করলে, শুধু দণ্ড দিয়ে নয়, আলো দিয়ে, শক্তি দিয়ে, বিচার ক্ষমতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে—

Sensations, stabs and edges of desire
And passion's ieaps and brief emotion's cries
A casual colloquy of flesh with flesh
A murmur of heart to longing workless heart
Glimmerings of knowledge with no shape of thought
And jets of subconscious will or or huuger's pulls
All was dim sparkle on a foaming top.

কামনার শতশাণিত আঘাত, তার তরঙ্গভঙ্গ, তার তীব্রতা, তিক্ততা তার ক্ষণস্থায়ী প্রণয়, এক দেহ-সীমার সঙ্গে আর এক দেহ-সীমার ক্ষণিকের সংলাপ, হৃদয় থেকে হৃদয়ের গুঞ্জন, অবচেতন ইচ্ছার তীব্র স্ফুরণ, ক্ষুধার তাড়না সবই হচ্ছে একটা ফুটন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপরের ক্ষীণজ্যোতি প্রচ্ছদপট। তাই তার তৃতীয় দান হলো—দৃষ্টিদান।

A little light in a great darkness born.

তিমির নিবিড় অন্ধকারের মাঝে একটু আলোর দীপ্যমান রেখা, তবু সে আলো এমন আলো নয় যে—নিয়তির চক্রের অর্থকে সম্যক্ বুঝতে পারা যায়—

Life knew not where it went, not whence it came,

কোথায় সে যায়, কোথা থেকে সে আসে—কোন অব্যক্তে তার উদ্ভব, কোন ব্যক্তে তার ক্ষণিক বিচ্ছুরণ—আবার কোন অব্যক্তে হবে তার সমাধি—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

ঊর্ধ্বের পথে যেতে যেতে মানব সত্তার প্রতীককে এই ক্ষুদ্র জীবনের দেবতাদের সঙ্গে (The God--heads of the Little life) বারে

বারে পরিচিত হতে হয়। এই যে জীবন, এর বিস্তার বা সাম্রাজ্য

......upon the margin of the Idea
Protected by ignorance as in a shell.

অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র জীবন অজ্ঞানের আবরণে সুরক্ষিত হয়ে মহাভাবের ঠিক দোরগোড়ায় আস্তানা পেতেছে—

Ringed with the skies and seas of ignorance and kept it safe from truth and self and light. তার চতুর্দিকের আকাশে সমুদ্রে স্বপ্নের দম্ভের অজ্ঞানের বেড়া, সেখানে সত্যাশ্রিত আলোর জ্ঞান ঢুকতে পারে না, উপরের আলো মাঝে মাঝে সার্চলাইটের মতো এসে পড়ে না যে তা নয়।

Stab the night's blind breast

কবির উপমায় এলো—এ আলো হচ্ছে রাত্রির অন্ধ বুকের উপর আলোর শাণিত আঘাত। তখন কারুর কারুর পুরোনো স্মৃতি জেগে ওঠে না যে তা নয়—যে তারা দিব্যের সন্তান এবং

Awake in mind an echoing thought of word.
জাগিয়ে তোলে সেই স্মৃতি,
কিন্তু সাধারণতঃ
Make knowledge a poison, virtue a pattern dull
And lead the endless cycles of desire.

তবে বহুর কাছে জ্ঞানের ফল স্বাদু নয়, বিষে ভরা যাদু, সৎকর্মকে এরা মনে করে একটা অর্থহীন পুনরাবৃত্তি, এবং অনির্বাণ কামনার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বললেন—

Soulless minds, guideless lives
আত্মজ্ঞানহীন মন, চালকহীন জীবন।

কিন্তু দিব্যজীবনের নিজের একটা অভিব্যক্তির সুর আছে,

Nature steps in to the eternal light

মহাপ্রকৃতি নিজেই এগিয়ে আসেন সেই পরম আলোকের রাজ্যে—যেন দেখা যায় যে একদিকে,

enormous brute machinery—জান্তব শক্তির দ্বারা পরিচালিত যন্ত্র আর একদিকে a slow unmasking of the spirit in things উন্মোচনের খেলা।

The spirit became matter and lay in the whirl. দেখা গেলো এই যে, জড় জগতের মন্থন স্পন্দন আন্দোলন চলছে—তারই মধ্যে, সেই আবর্তন-বিবর্তনের মাঝখানে বসে আছেন আর এক সত্তা—একে মায়া বা মায়ী বলি, দিব্য বলি, প্রকৃতি বলি, যাই বলি না কেন—জড়ের মধ্যে এই দিব্যচেতনা ঘুমিয়ে ছিল, তাকে জাগানো হলো, তার ঘুম ভাঙলো—

A dream of living woke in Matter's heart.
A God-head woke but lay with dreaming limbs
Her house refused to open its doors.

দেবতার ঘুম ভেঙে গেলো বটে, কিন্তু প্রকৃতির ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন দুয়ার বন্ধ—বন্ধ ঘরের বাইরে থেকে মানুষ দেখলে শুধু সেই অব্যক্ত বিরাটের ছায়াকে—a shadow of the unmanifest. তবু ছায়াই অনেককে অনেক দিক থেকে জাগিয়ে দিলে—মহাপ্রকৃতি তো তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, একটু স্তনপান করিয়েই ছেড়ে দিলেন মহামানসের বিশ্বপরিক্রমায়—

As one who walks unguided through strange fields
Tending he knows not where, nor with what hope
He trod a soil that failed beneath his feet.

কিন্তু ধাত্রী প্রকৃতি সরে দাঁড়ালেও হাঁটি-হাঁটি পা-পা মানুষ এগিয়ে চলবেই,—চালকহীন—অজানা দেশকালের সীমানার মধ্য দিয়ে—কোন

দিকে সে চলেছে জানে না, কি তার আশা সে বোঝে না, তবু শিশু যেমন নামের নেশায় মাকে ডাকে, মানুষও তেমনি পূর্বস্মৃতির ক্ষীণ আমেজ ধরে টলতে টলতেও চলে। এই হচ্ছে তার স্বধর্ম—শুধু চরণশব্দ বরণ করে সে চলেছে, নিঃসীম সে যাত্রা, সে শাশ্বত পদাতিক,

His only sunlight was his spirit.

আত্মার স্পষ্টালোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপশিখাটি হাতে নিয়ে গভীর অন্ধকারে যাত্রী-মানুষের এই অভিযান—সে এগিয়ে চলবে, ক্ষুদ্র দেবতাদের রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে সে চলে যাবে—তার দিবাকর (তীর্থদেবতা) তাকে পথ দেখাবে।

মনে পড়ছে অন্ধ এক ভক্ত চলেছেন হিমালয়ের পথে, বাইরের দিক দিয়ে তাঁর চোখ বন্ধ—কিন্তু তুঙ্গীনাথ যিনি যুগে যুগে ত্রিযুগী, যিনি নারায়ণ, তাঁর আহ্বান তিনি শুনেছেন—জৌনপুরী রাগ চৌতালে তিনি ধ্রুপদাঙ্গ ধরেছেন মনের আনন্দে—

তেঁরো নাম চহুঁক ভরপুর রহো
তুঁহি দূরত ফিরত
তুঁহি পবন মে করত কলোল।
তুঁহি তান তুঁহি মান তুঁহি রোম রোম রম্ রহো
তুঁহি মুন, তুঁহি বোলে বোল
তুঁহি পরমতীর্থ, তুঁহি পরম অর্থ
তুঁহি এক অবার্থ, যোগীজন গাবে

———

দ্বাদশ উল্লাস

রবীন্দ্রনাথ বলতেন—দেখো, দেবতাদের কাব্য—মরেও না, জীর্ণও হয় না। তারা শুধু হরিত নয়, হরিতস্রজ। মনে পড়ছে, উপনিষদকারের এক অপূর্ব গল্প, বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে যা লিপিবদ্ধ আছে। এইতো দেবতাদের কাব্য। আকাশে কালো মেঘ উঠেছে, তাপস-নিঃশ্বাস বায়ে মহাকালের জটায় লেগেছে ঘটা—প্রজাপতি দেখছেন শুধু একটি অক্ষর—'দ'। দেবতা, মানুষ, অসুর, সবাই ব্রহ্মার কাছে হাজির—পিতামহ, মন্ত্র দিন।

সবাই সমিধপাণি, ব্রহ্মচারী, তপস্বী—নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা তিতিক্ষা অনুযায়ী ধ্যান, মনন, নিদিধ্যাসন, করেছেন।

প্রথমে এলেন দেবতারা, প্রজাপতি দিলেন একঅক্ষরী বিদ্যা—'দ', তারপর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—বুঝেছো?

—হ্যাঁ বুঝেছি—

—কি বুঝেছো?

আপনি বলতে চাইছেন—দম্যত—দমন কর, দমন কর, দেবতারা শুদ্ধ বুদ্ধির লোক, তাঁরা অর্থ করলেন—ইন্দ্রিয় দমন কর, লোভ দমন কর, হিংসা দমন কর, তৃষ্ণা বা তনহা দমন কর—দমন করা মানেই প্রকৃতির উচ্ছ্বাসকে গ্রহণ না করা, তার সাম্যে বা সমতায় ফিরে যাওয়া।

মানুষ গেল প্রজাপতির কাছে—পিতামহ মন্ত্র দিন।

তিনি তাদেরও বললেন—এই নাও অমৃত মন্ত্র, যা ধ্বনিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে—'দ'।

তারপর প্রশ্ন করলেন—বুঝেছো?

—হ্যাঁ বুঝেছি. .

—কি বুঝেছো?

মানুষ মাথা নত করে বললে—'দ' মানে দাও, দান কর, দান কর—মানুষ চায় প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, বীর্য, কিন্তু তার চাওয়ার সীমা নেই, লোভের অন্ত নেই, সে স্বল্পে তুষ্ট নয়, কিন্তু নিজে ভোগ করেই সে তৃপ্ত নয়—তার অন্তরাত্মা চায় দিতে—তার কাছে দেওয়া মানেই পাওয়া—

নিয়ে, পেয়ে, দিয়ে সে 'হতে' চায়—এই তার সাধনা—তাই সে যেমন মহাপ্রকৃতির কাছে চায়—রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, মনোরমা ভার্যা দাও—তেমনি বলে—নাও, নাও, আমার সব নাও—

মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।

মানুষের ধর্মই হচ্ছে দেওয়া, নিজেকে দেওয়া, ভালোবাসা মানেই দান—আত্মদান।

তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন
না হয় তোমার নাই বা রইলো প্রয়োজন।

তারপর এল অসুররা, তারাও সেই উপদেশ পেলে—'দ'
প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—বুঝলে ?

বুঝেছি, দয়ধ্বম্—দয়া কর, দয়া কর, করুণা, মৈত্রী (Compassion,) চাই, অসুররা হচ্ছে সেই জীব, যাদের মমতা কম। অনন্ত মমতা থেকেই সর্বত্র সমতা।

তাই বৃহদারণ্যকের ঋষি বললেন, আজও যখন আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমে, বজ্রবৃংহতির মাদল বাজে, তখন আমরা প্রজাপতির সেই বাণীই শুনি—দ, দ, দ—

তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।

এই একই মন্ত্রকে তিনের তুরীয়ে তুলে সমন্বয় করলেই বৃহত্তর জীবনের সাম্রাজ্যে পৌঁছানো যায়।

কিন্তু পদে পদে সন্দেহ, সংশয় বেদনা, শ্রদ্ধাহীনতা তখনও লেগে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীর ষষ্ঠ সর্গে (The Kingdoms and God Heads of Greater Life) সেই কথাই বললেন—অন্ধকার টানেলের তিমিরাচ্ছন্ন পথ—দূরে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা—

Tormented, crossed by wings of doubtful haze
Adventuring with a voice of roaming winds
And crying for a direction in the void.

এইতো মানবাত্মার শাশ্বত কান্না—দেখা দাও, দেখা দাও, হে পূর্ণ, পথ দেখিয়ে দাও এই মহাশূন্যের মাঝে—জগন্নাথস্বামী, নয়নপথগামী ভবতু মে—জীবনের আকাশে যে কেবলই ঝড় ঝঞ্ঝা, সংশয় বিদ্বেষ—মন্ত্র দাও, ঐ 'দ'-এর মতো একটি মন্ত্র—হারিয়ে যাওয়া সত্তাকে খুঁজছে আমার অন্ধ আত্মা—

অন্ধজনেরে দেহ আলো—

সব সাধককেই এই অদ্ভুত প্রহেলিকাময় জগৎ পার হয়ে আসতে হয়। ঐ 'দ'-এর একটা পেলেই সে মনে করে বুঝি সব পাওয়া হয়ে গেলো। তা হয় না, এই আত্মিক জগৎ হচ্ছে অনন্ত—সেটা শুধু দেহের জগৎ নয়, মনের জগৎ নয়—সেখানে শুধু স্বপ্ন, শুধু কল্পনা, শুধু সুষুপ্তিই নেই—শুধু জীবনবাদ, জীবনবোধ, জীবনবোধি-ই নেই—এর অতিরিক্ত মানসভূমিও আছে—শ্রীঅরবিন্দ যার নামকরেছেন—Supramental—অর্থাৎ আরো ঊর্ধ্বে মনের স্তব্ধভূমিকে অতিক্রম করে যে স্তর।

সে স্তরের কথা এখন থাক, কিন্তু নীচের স্তরেও মানবাত্মা কি পায়—

The marvels of a twilight wonderland

জ্ঞানের শতসূর্যের প্রখর দীপ্তি নেই বটে, কিন্তু বিস্ময়ে মন জাগছে, তার মানস সরোবরে একটি একটি করে জীবন হতে জীবনে প্রেমের পদ্মকোরকটির পাপড়ি খুলছে, তখন শুধু খোঁজা, শুধু চাওয়া, শুধু সন্ধান—

Life was a search but never a finding.

কিন্তু শেষ কোথায়, যিনি অশেষ, যিনি অভাবিত, যিনি কল্পনাতীত

আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে
দেয়নি যে দেখা আজো কোনোখানে

শ্রীঅরবিন্দের মহাযোগের এই সীমাতীত সীমা রবীন্দ্রনাথের সেঁজুতির ঐ কবিতায় যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। তারপর—

Then dawned a greater seeking, broadened sky
First came the kingdom of the morning star

A twilight beauty trembled under its spear
And the throb of promise of a wider life
Then slowly rose a great and doubting sun
*　　*　　*　　*
Yet something seemed to be achieved at last.

সকল চাওয়া-পাওয়ার মাঝে আরো বড় পাওয়ার প্রার্থনা, আরো ঘনীভূত নিবেদন মূর্ত হয়ে উঠলো—Greater seeking. আকাশের সীমা বৃহত্তর হয়ে উঠলো, জীবনের পরিধি আরো মহত্তর, প্রেমে প্রোজ্জ্বল, কর্মদীপ্ত, প্রজ্ঞাঘন হোল। আকাশে প্রভাত তারার উদয়, আলোর অস্ফুট রেখা, অন্ধকার কমে আসতে লাগলো, ভোরের পাখী ডাক দিলে—

রাই জাগো, রাই জাগো—
শুক বলে সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি
সারী বলে মেঘমালার নিত্যনূতন সৃষ্টি
তাই সে চিরন্তন।

সমস্ত আকাশ কাঁপতে লাগলো নতুন এক আবেগে—উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে এক দিব্য উন্মেষ—অন্ধকারের পার হতে এক হিরণ্ময়ের ব্যঞ্জনা, এক আদিত্যবর্ণ মহাদ্যুতির আবির্ভাব, এক মহৎ স্বরূপের প্রতিচ্ছায়া জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে। এই তো বৈদিক ঋষির উষা, মঘোনী, রিতাবরী—

বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী
ওরে মন খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে।

পূর্বদিগ্বলয়ে উদিত হচ্ছেন দিনমণি—
প্রভাত সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ—

কিন্তু অন্য কবি বা সাধক যা পেলে সন্তুষ্ট শ্রীঅরবিন্দ তা নন। তাঁর কাছে ঐ সূর্যোদয় তখনও 'doubting sun'—তবু তিনি স্বীকার করছেন—কিছু পাওয়া গেলো—Something seems to be achieved—আর একটি ফল হলো যে, সত্যের এক নব দ্বার খুলে গেল, যখন—This realm inspires us with our vaster hopes—নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন প্রেরণার জগতে সাধক মানুষ এসে পৌঁছল। সাবিত্রীর কবির কল্পনা এখানে সীমাহারা—শ্রীঅরবিন্দের উপমা শুনুন,

Eternal in an unclosed Infinite
A mounting endless possibility
Climbs high in a topless ladder of dream.

যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি নিত্য—তিনি বসে আছেন অনন্তের মন্দিরে, —সে মন্দিরের দুয়ার খোলা (unclosed)—সে অনন্ত সত্যই ন-অন্ত—তার সম্ভাবনার সীমা নেই, মনের, এমন কি শুদ্ধবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মন, যে মনের শক্তির শেষ নেই, সে মনও ধরতে পারে না সেই বিরাট সম্ভাবনাকে—শুধু আভাস দিতে পারে অধিমানসে—তাই সে সত্য অতিমানস—মনের উপরে (অধি) শুধু নয় মনের উর্ধ্বে, তাকে অতিক্রম করে (অতি) অবাঙ্‌মানসগোচর। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতো সাধকের চোখে পরিণতির শেষ নেই, নতুন করে দেখবার, বলবার, শোনবার সুযোগ প্রতি মুহূর্তে; প্রতিটি ক্ষণে আমরা বদলাচ্ছি, নতুন হচ্ছি, অনন্তের নব নব স্পর্শ পাচ্ছি, নতুন নতুন সংজ্ঞা, নব নব চেতনা, নব অভিব্যক্তি। এই অনন্তের মাঝেই আমরা ডুবে আছি, এই রস-সাগরেই বিলীন হব—এরই মাঝে আমার সান্ত, এরই মধ্যে আমার ছন্দ, আমার দোল, আমার মাত্রা, যতি, আঙ্গিক, রূপ, অরূপ,—এই হলো মহাপ্রকৃতির খেলা। এই যুগে এই সত্যকে প্রথম বিশেষভাবে জানিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুটি কথায়—ব্রহ্ম কালী, কালী ব্রহ্ম—পরম দিব্য আর তার চিদ্রূপা শক্তি—জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল। তিনি বললেন—আমি দুটোই লই, তা না হলে আমার ওজনে কম পড়ে। গীতার প্রকৃত শিক্ষাও তাই। শ্রীঅরবিন্দ আরও এগিয়ে দিলেন এই সত্যটিকে। সাধকের প্রতিটি অনুভূতিতে এই সত্য কি

রকমভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, কী ধরনের লীলায় তারই কাব্যিক প্রকাশ সম্ভব,—সাবিত্রীর স্তরে স্তরে তারই ক্ষীণ পরিচয় কাহিনীরূপে প্রতীকরূপে সাবিত্রীতে তাই ভাষা হার মেনেছে, ছন্দ উল্টে গেছে, বর্ণনা গুরুগম্ভীর হয়েছে—কবির মনে এত উপমা এসেছে যে, তিনি তাঁর কাব্যরূপকল্প হাতড়ে বেড়াচেছন। সবিত্রী তাই কল্পনার কাব্য নয়, স্বতঃউৎসারিত (automatic) সত্যদৃষ্টির বর্ণনার প্রয়াস—মনকে অতিক্রম করে যে দৃষ্টি। তাই আমাদের কাছে স্থানে স্থানে তা দুর্বোধ্য হয়েছে—(চেতনার সে স্তরে আমরা পৌঁছাইনি). স্থানে স্থানে বহু বাক্য গাঁথা হয়েছে, যা আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন, লোকে বলেছে এ কাব্য নয়। শুধু কথার পর কথা, কল্পনার পর কল্পনার রং চড়ানো flights of imagination"

প্রকৃতির কি কাজ তারই বিচার করেছেন শ্রীঅরবিন্দ—

> To catch the boundless in a net of birth
> To cast the spirit into physical form
> To lend speech and thought to the Ineffable

মায়ের কী খেলা, প্রকৃতি চাইছেন পুরুষকে ধরতে, পুরুষ চাইছে সেই লীলায় ধরা দিতে—প্রকৃতি সীমার জাল দিয়ে ধরবেন অসীমকে অনন্ত সত্তাকে. দেখবেন তাঁকে রূপ-রস-স্পর্শ নামের মায়ায় অর্থাৎ মিত করে. সীমিত করে—কাকে—না যাঁকে বর্ণনা করা যায় না, দেখা যায় না, ভাবা যায় না—যিনি অবর্ণনীয়, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়।

মায়ের এই যে খেলা, একে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

> She has lured the Eternal into the arms of time

কালের ফাঁদে ধরা পড়লেন মহাকাল—মায়া আর মায়িন্। শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ ভাষায়—

> পঞ্চভূতের ফাঁদে
> ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে

—কথাটা শুনতে অদ্ভুত, কিন্তু লীলার রহস্যই এই। স্বয়ং মহা-প্রকৃতিও জানেন না—কি করছেন তিনি, এর মধ্যে Illusion's trick

বা ফাঁকি আছে কিনা। স্বয়ং মহাশক্তিও পারছেন না তাঁর লীলার স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে সত্য করতে—

The greatness she has dreamed,
her acts have missed,
Her labour is a passion and pain
A rapture and pang, her glory and her curse.

ঠিক মনের মতো হচ্ছে না কেন—কেন আনন্দের মধ্যে আসছে বেদনা, সাফল্যের মধ্যে আসছে খুঁত, উন্মাদনার মধ্যে ক্লান্তি। তার কারণ আধার হচ্ছে অশুদ্ধ, মায়ের কাজে যোগ দিচ্ছে না মানুষ, human material—এর গলদ। প্রকৃতির এ হচ্ছে একটা 'Superb madness'—কিছুতেই সে সন্তুষ্ট নয়, উন্নত থেকে উন্নততর জীবে, ও চেতনায় সে অভিব্যক্ত করবে সব কিছুকে। এমিবাকে করবে পুরুষোত্তম—চঞ্চলা নদী শুধু এগিয়ে যাবে না, ফুরিয়ে যাবে না, নব নব বিভূতিতে বিকশিত হয়ে নন্দিত হবে, ছন্দিত হবে, পূর্ণ হবে।
This greatness must create—শুধু পৃথ্বী সত্তায় নয়, স্বর্গে, নরকে, দ্যুলোকে, ভূলোকে।
এই মহাশক্তি সর্বত্র, জড়ে, চেতনায়,—

Housed in the atom, buried in the clod. অণুতে আছেন তিনি, মাটিতে আছেন—অবরুদ্ধবীর্য, এই শক্তি—Wonder worker অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

In light or dark She keeps her tireless search
Time is her road of endless pilgrimage.

মহাপ্রকৃতি খুঁজছেন—তাঁর বিরাম নেই, আলোয় খুঁজছেন, আঁধারে খুঁজছেন, সেই নিত্য সত্য বস্তুকে—তাঁর হ্লাদিনী শক্তি তবেই আত্মস্থ হবে—এই তাঁর আত্মত্যাগ, প্রেমসাধনা। এই হলো শিব ও শিবানীর রহস্য, মহাকালের ও মহাকালীর—পুরুষ ও প্রকৃতির, কৃষ্ণের ও রাধার। এইতো যুগলের সীমাহীন তীর্থযাত্রার অপূর্ব রভস।

প্রকৃতির লীলা চলেছে তার প্রতিটি কাজে, প্রতিটি সত্তায়, প্রতিটি চেতনায়, প্রতিটি রং-এ। তার কাজ পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্গে দয়িতের স্পর্শ পেয়ে অর্ধনারীশ্বরের সম্পূর্ণত্বে মিশে যাওয়া। মানুষ হচ্ছে তার অভিব্যক্তির একটি বিশিষ্ট যন্ত্র। প্রকৃতি নিজেই পুরুষকে ঘুম পাড়িয়েছিলেন, তার বুকের উপরে নৃত্য করেছিলেন—এখন তাঁর ইচ্ছা হয়েছে—সে ঘুম ভাঙাবেন—অকালে নয়, স্বকালে। স্বপ্ন ভেঙেছে বটে কিন্তু সুষুপ্তির জড়িমা যাচ্ছে না—সত্যের আভাস আসছে, আলো ফুটছে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যদর্শন হচ্ছে না। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের এই খানেই বিশেষত্ব—ভগবানে গিয়েও সে থামতে চাইছে না—তারও উর্ধ্বে সে যাবে, দেখবে, বুঝবে, জানবে—অর্থাৎ অতিভাগবত জীবন, যেখানে পুরুষে আর প্রকৃতির সর্বস্তরে আলিঙ্গিত সত্তা বিকশিত হয়েছে।

Thought looked at thought and had no need of speech
Emotion clasped emotion in two hearts
They felt each other's thrills in the flesh and nerves
Or melted each in each and grew immense.

তনুতে তনুতে মিলন শুধু নয়,—থর থর কাঁপই, ভাবে ভাবে গদ গদ, সমন্বয়, ভাষার প্রয়োজনে নয়, বাক্যস্খলিত নয়, —দুহুঁ মাঝে দুহুঁ যেন গলে গেলো, প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গ তরে, ব্যাকুল হলো, এ সবই সত্য কিন্তু—তারও উর্ধ্বে প্রেমের যে সার্থকতা, সেই হলো ভাগবত প্রেম—দুটি কথায় কবি শ্রীঅরবিন্দ বললেন—Grew immense —নিজেকে ছাড়িয়ে বিরাট হওয়া—আত্মসম্প্রসারণই মিলনের মূল অর্থ—নবা অরে পুত্রস্য প্রীতিকামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি—সেই আত্মনের প্রীতির জন্য। এই হচ্ছে সংসার চক্রের সাম্যরস বিধান।

ত্রয়োদশ উল্লাস

আলোর সাধনা আর অমৃতের সাধনা এক হয়ে গেলো ঋষিকবিদের অনুভূতিতে।

একবার ঘরের অভয় স্বাদ পেতে দাও তাকে বেড়ার বাইরে
আপনাকে চেনার সময় পায়নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা, মাটির পর্দায়
পর্দা খুলিয়ে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ
তোমার সঙ্গে তার রূপের মিল
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে
তার জীবনের সুখদুঃখ আহুতি দাও
জ্বলে উঠুক তেজের শিখায়
ছাই হোক্ যা ছাই হবার

সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে মৃত্যু তামসীর তাণ্ডবী লীলা। ছিন্নমস্তা বগলা হবেন অমলা কমলা। মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, অপূর্ণতা। সেইজন্য প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে, সেই মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি দাঁড়াবে কে বজ্রের আলোতে। চেতনার সঙ্গে আলোর থাকবে না কোন ব্যবধান। কে হবে মহা-মৃত্যুঞ্জয়ের উপাসক, যে শবকে ফিরিয়ে এনে শিবে পরিণত করবে।

ভাগ্যবিধাতার লিপিকে অগ্রাহ্য করে দুর্ভাগ্যের সামনে দাঁড়াতে পারে কোন শক্তিমতী ?

Her soul arose confronting time and fate
Immobile in herself, she gathered force

শক্তি তার কুলকুণ্ডলিনীর পূর্ণ চক্রে বসলো সেদিন, যেদিন বিধি-লিপির কঠোর বিধানকে বদলাতে হবে—That was the day when Satyaban must die—সত্যবানের মৃত্যু হবে—

প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষ সূর্যঃ

মৃত্যুই অমৃতত্বে আনয়ন করে, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

মৃত্যুই চলে, মৃত্যুই চালায়, সঞ্চরমাণ কালের ক্লান্তি দূর করে। মৃত্যু প্রাণেরই একটি ভঙ্গিমা। প্রাণের অন্নময় ভূমি থেকে যে বিদায় নিয়েছে তাকে যমের অর্থাৎ কালের নিয়মচক্র থেকে পুনরায় ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞানময় আনন্দময় ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করবার যে সাধনা সেই হচ্ছে সাবিত্রীব তপস্যা। মৃত্যু, কামনা আর সংঘাত এই যে ত্রয়ী, এই হচ্ছে দিব্য প্রাণের ছদ্মবেশ—একে উন্মোচন করার প্রয়াসই সাবিত্রীর সাধনা। উন্মীলিত হবে কল্যাণতম রূপ—

Disown the legacy of your buried selves

অস্বীকার করো আত্মকেন্দ্রী গুহাশায়িত নিজেকে, বিকশিত হোক মাতৃশক্তি—

Mother now in her arose

এবং সেই শক্তিই

A living choice reversed fate's cold dead turn

বিধির নির্মম বিধান উল্টে দিতে ঐ এক শক্তি—অশ্বপতির যোগ এই শক্তিকে ধরায় নামিয়ে এনেছিল বিশ্বমানবের আর্তির জন্য।

সাবিত্রীর কাহিনী মহাভারতের। নিঃসন্তান অশ্বপতি সন্তান কামনায় তপস্যায় বসলেন। তিনি চললেন স্বর্গমর্ত্যআকাশ ভেদ করে অসীমের পথে, সে পথের শেষ নেই, কাল থেকে কালান্তরে তার যাত্রা। তিনি মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি, তিনি শেষ কথা জানতে চান। তৃতীয় পর্বে আমরা পাই House of the Spint-কে, সেখান থেকেই পুর্নযাত্রা সুরু House of the Supreme Spint-এ যেখানে বিশ্বমাতা আসীনা, তিনিই শুধু রূপরম্যা নন, তিনি শংকরী, ভয়ংকরী, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহেশ্বরী তিনিই আদিমা শক্তি (Primordial Creativity) যাঁকে আমরা চণ্ডীতে ডেকেছি প্রসীদ দেবেশি, প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি। সবিতৃ হতেই সাবিত্রীর উৎপত্তি—সবিতা আলোর দেবতা—সু মানে প্রজনন, সৃষ্টি, তাই সবিতা জগতের প্রসবিতাও বটে। স্বর্গীয় সুধা 'সোমও' ঐ 'সু' হতে উদ্ভূত, আনন্দমের চিহ্ন। লোক-লোকান্তরের

মধ্য দিয়ে অর্থাৎ অবচেতনা, বুদ্ধিচেতনা পেরিয়ে বোধিচেতনার সাগরে পাড়ি দিলেন অশ্বপতি অর্থাৎ জীবনের যিনি অধীশ্বর, একা অনন্তের পানে, অজ্ঞেয়ের মাঝ দিয়ে, হোমাগ্নিপূত সাধক। অপরূপ কবিতায় ফুটে উঠলো সেই অভিসার যাত্রার কাহিনী—

Alone he moved, watched by the infinity
Around him and the unknowable above

যোগী অশ্বপতির দৃষ্টিতে ধরা পড়লো

Here all Experience was a single plan
All came at once into his single view
He was one spirit with that Immensity
A seer within who knows the ordered plan

এখানে সম ব্রহ্ম, সর্ব ব্রহ্ম—যেথা যেথা নেত্র পড়ে—এই যে সামগ্রিক একমুখী দৃষ্টি এই তো সাধনার প্রথম অঙ্গ।

কিন্তু মহতী প্রাপ্তি এখনও হয়নি—তাই দৈববাণী হলো

O soul, it is too early to rejoice
Thou hast reached the boundless silence of
the self

*   *   *   *

Only the everlasting No has neared

তুমি এসেছো নেতিত্বের গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে, তোমার মনকে কেড়ে নিয়েছেন সেই তুঙ্গীনাথের নিশ্চলা সমাহিতির তীর্থ

But where is the lover's everlasting Yes

কোথায় সেই চিরপশ্যন্তী বাণী প্রেমিকের হাঁ, আমি আছি, অয়মহং ভোঃ, তুমি আছ—সত্য আছে স্থির। অনুভূতির আর-এক স্তর থেকে দেখতে গেলে আর-এক কবির কথায়

চেতনার রঙে পান্না হবে সবুজ চুনি উঠবে রাঙা হয়ে
তত্ত্বজ্ঞানীর না, না, না ফুটে উঠবে হাঁ হয়ে রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

সেখানের কবি বলছেন, আমি অধীর, বাঁধনহারা

অর্ঘ তোমার আনিনি ভরিয়া .
বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণপ্রাণের
আপন স্রোতে
মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধন হারা
অধীরতা তার মিলনে তোমার
হোক না সারা

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দে এই অধীরতা শান্ত, তিনি সেতুকে খুঁজে পেয়েছেন

The bridge between the rapture and the calm
The passion and the beauty of the bride
The chamber where the glorious enemies kiss
The smile that saves the golden peak of things

একদিকে চঞ্চল জীবনের 'grand passion' আর একদিকে শান্তির পারাবার, নৈঃশব্দের তটভূমি—সেইখানেই বসে আছেন দীপ্ত অর্ধনারীশ্বর পূজার বেদীতে—কপালমালা পরিশোভিত, মন্দার-মালা পরিশোভিতা—নব জীবনের বিপুল ব্যথায় শ্যাম ও শ্যামা জেগেছে, শিব ও শিবানী দুলছে, যেন রবীন্দ্রনাথের

কুহেলি গেলো, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি—
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি

তারই পিছনে যে স্তব্ধ অচঞ্চল—The symboled Om. সত্যসন্ধ অশ্বপতি তখন আরো এগিয়ে চলেছেন—তিনি নামাবেন সেই আলোককে—Into the texture of our bounded humanity. এই সীমিত দেহের প্রতিটি অণুতে।
আকাশবাণী উঠলো—না, না, মানুষ তুমি পারবে না, আমার অমেয় অবতরণ তুমি জাগিয়ো না—সে গুরুভার বহন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। মানবের সে শক্তি যে আছে তারি সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সেই অবতরণের প্রকাশ। তাঁর কাব্যে তারই কাহিনী। অশ্বপতি অনেক বাধা মূক বিরাট বাধা সরিয়ে লোকে লোকান্তরে পরিভ্রমণ করে সমস্ত কামনাকে টুকরো টুকরো করে বিশ্বজননীর চরণে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর সত্তার রূপান্তর হলো, অমৃতস্পর্শের অধিকারী হলেন তিনি।

His being sprea to embraced the universal
United the within and the without

অন্তর ও বাহির ঐক্যে এক হ'ল—to make of life a cosmic harmony—জীবনের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একতারায় একসুরে বাঁধা হবে। তখন—

One shall descend and break the iron law

প্রেমের মহিমায় মৃত্যুর নিগড়কে যিনি ভাঙবেন তিনিই সাবিত্রী। নিঃসন্তান অশ্বপতি তখন দৈববলে বলীয়ান্ হয়ে তপস্যার বরে সাবিত্রীকে কন্যারূপে পেলেন। সেই কন্যা বড়ো হলো, যৌবনবতী হলো, পতিকামা হয়ে সে বনে গেলো এবং রাজ্যহীন বনবাসী দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবান্‌কে স্বেচ্ছায় বরণ করলে। এ পর্যন্ত মহাভারতের কাহিনীতে কোন বিশেষ গতিময়তার পরিচয় নেই। প্রাচীন কালের ঐতিহ্যে যে কোন কামনার জন্য বিশ্বশক্তির কাছে তপস্যায় বসাটা কিছু নূতন নয়। এই সময়েই হোল নারদের আবির্ভাব। দেবর্ষি জানিয়ে দিলেন যে সত্যবান্ স্বল্পায়ু—বিশ্ববিধানের অমোঘ নিয়মে তার মৃত্যুদিন আসন্ন।

আমরা জানি—সাবিত্রী জানতেন যে সত্যবানের মৃত্যু হবে এক বছর পরেই। সাবিত্রী কিন্তু অচলা অটলা রইলেন—অগত্যা অশ্বপতিকে মত দিতে হলো। তারপরে এলো সেইদিন যেদিন সত্যবানের মৃত্যুর বিধিনির্ধারিত দিন। সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গেই গেলেন। নিয়মমত সত্যবানের মৃত্যুও হলো। তার পর যমরাজের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে তাঁকে বিচারে পরাস্ত করে মৃতস্বামীর জীবন নিয়ে সাবিত্রী ফিরে এলেন এই সংসারে। যমরাজ তাঁকে নানা বরও দিলেন। মহাভারতের এই অপরূপ কাহিনীকে কেন্দ্র করেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো স্তব্ধের মানস সরোবরে শুধু হংসবলাকার দলই নয়, শব্দময়ী অপসরী রমণীরা নয়, স্পর্শ পড়লো সেই পাদপীঠে, প্রোজ্জ্বল জ্যোতির ললাটে ভূমাময়ীর তিলকচিহ্ন। শ্রীঅরবিন্দের কল্পনায় অশ্বপতি হলেন মানবাত্মার ঊর্ধ্বগতির, অভীপ্সার বাহক, সাধনার প্রতীক। এই অভীপ্সাই বেদে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিশিখার দ্যোতক। মহাশক্তির অবতরণিকার প্রধান ভূমিকায় নামলেন সাবিত্রী, যিনি কনকোজ্জ্বল বরণী।

A world's desire compelled her mortal birth

অশ্বপতির যোগ মহাশক্তিকে নামিয়ে এনেছিল বিশ্বমানবের আর্তি-হরণের জন্য—

A playmate in the mighty mother's game

কে হবে সেই শক্তির লীলাসহচর—মহাসাধিকার সাধনার ধারার উপযুক্ত বীর্যবান্ বাহক ও আধার কে—না, যে নিজে সত্যবান্ অর্থাৎ সত্যে বিধৃত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার পূর্বে তার নিজেরও রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ তার রক্তে রয়েছে খণ্ডের বীজ। যতক্ষণ না সাবিত্রীর শক্তি সেই মৃত্যুকে অতিক্রম করছে ততক্ষণ ঐ মৃত্যুর দ্বারা ছাড়া রূপান্তরের সম্ভাবনা নেই—Death is a passage, মৃত্যুই চলে, মৃত্যুই চালায়। মৃত্যুতীর্থে স্নান করিয়ে রাত্রির গহিনে ডুবিয়ে তাই সত্তাকে পরিবর্তিত করে নিতে হবে এবং একমাত্র পরাশক্তিই সেই সাহায্য করতে পারেন। তাই সাবিত্রীর সঙ্গে সত্য-বানের মিলন cosmic necessity, সে মিলন যোগেরই ক্রিয়া বা

ক্রিয়াযোগ। যে সত্তা এই বিশ্বের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ব্যষ্টির মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, মানবমনের মধ্যে, বিশ্বের অণুতে রেণুতে, তিনি আবার নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন কোটিতে—এই নামাওঠা, যাওয়াআসার মধ্যেই মায়ের ছেলে মায়ের ঘরে ফেরে—তাই পরম ভাগবত যিনি তিনি শুধু সুদূরের দেবতা ন'ন—সেই উর্ধ্ব আনন্দের রাজ্যে, স্তব্ধের ভূমিতে আমিও উঠবো—Even the highest rapture time can give is a mimicry of ungratified beatitudes—কিন্তু যা পেলাম সে যতো উর্ধ্বের আনন্দেরই হোক না, যা পেলাম না তাঁর রসাভাসেরও যে শেষ নেই,—তাই তাঁকেও নামতে হবে, তিনি নামছেনও, আমার মনের নিভৃততম কোণেও, গভীর অন্ধকারেও তাঁর আসন পাতা। সেখানে যে বীণা বাঁধা হতেছে 'বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা'। সব ভাস্বর হয়ে উঠবে তাঁর স্পর্শে, বদলে যাবো আমি, যে আমি হচ্চি—Becoming—যে আমি অনন্তেরই প্রকাশ, অখণ্ড বোধেরই এক অনন্ত সীমাহীন সীমানা। শ্রীঅরবিন্দ কাব্য তারই কাব্যিক প্রকাশ। ভাষার মাধ্যমে প্রতীক।

চতুর্দ্দশ উল্লাস

সত্যসন্ধ অশ্বপতি যখন আরও এগিয়ে চলেছেন—প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি নামাবেন সেই আলোককে—Into the texture of our bounded humanity. আকাশবাণী উঠলো—না, না, মানুষ তুমি পারবে না, আমার অমেয় অবতরণ তুমি জাগিয়ো না—সে গুরুভার বহন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক বাধা, মূক বিরাট বাধা, জীবনের শিকড়ে শিকড়ে বাধা. কিন্তু অশ্বপতি নিশ্চল, অটল—সব কামনাকে টুকরো টুকরো করে তিনি বিশ্বজননীর চরণে ছড়িয়ে দিলেন, তাঁর সত্তার রূপান্তর হ'ল, অমৃত স্পর্শের অধিকারী তিনি হলেন—

His being spread to embrace the universal
United the within and the without

অন্তর ও বাহির ঐক্যে এক হল—To make of life a cosmic harmony. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একতারায় একসুরে বাঁধা হবে। One shall descend and break the iron law.

প্রেমের মহিমায় মৃত্যুর নিগড়কে যিনি ভাঙবেন, যে শক্তি A living choice reversed fate's cold dead turn, বিধির নির্মম বিধান উল্টে দিতে পারে যে শক্তি—সেই শক্তিই জগৎপ্রসবিতার শক্তি—তিনিই সাবিত্রী। তাই সেই অপরূপ কাহিনীকে কেন্দ্র করেই ঝংকার দিয়ে উঠলো ছন্দের মানস সরোবরে শুধু হংসবলাকার দলই নয়, শব্দময়ী অপসরী রমণীরা নয়, স্পর্শ পড়লো সেই পাদপীঠে, প্রোজ্জ্বল জ্যোতির ললাটে ভূমাময়ীর তিলকচিহ্ন। শ্রীঅরবিন্দ যাঁকে 'A way farer towards the same goal as ours in his own way—' বলেছেন, সেই মহাকবির অনুপম ভাষার সাহায্যে এর কিছুটা প্রকাশ করা যায়—'নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির তমসার মাঝে;

কোন জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে নির্নিমেষে উদ্দীপ্ত নয়ান করিছে
আহ্বান

তাইতো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে বিপিনে বিপিনে।'

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাপক দৃষ্টিতে মহানিস্তব্ধের প্রান্তে, অনালোকিত অনন্তের মন্দিরে (unlit temple of eternity) নিবিড় আঁধার মাঝে চমকে অরূপরাশি—অন্ধকারের মাঝে জাগলো—The symbol Dawn আলোর প্রতীক—তার আলোড়ন—নির্বাক্ নামহীন অচিন্ত্যনীয়ের মাঝে স্পন্দন—মহাসমাধিস্থ শিবের যোগনিদ্রাভঙ্গের পূর্বাভাস—সুপ্তির তিমির বক্ষ ভেদ করে দীপ্তির কৃপাণ হস্তে তেজস্বী তাপস প্রতিদিনই ঘটছে—এটা নিছক বৈজ্ঞানিক সত্য ঘটছে—আমাদেরই Vital plane এ, Physical স্তরে, এরই রূপান্তর হবে না কেন মনোময় রাজ্যে। মহাভাস্বর আসছেন অগ্নিরথে, তূর্য বাজচে আকাশ পথে, চেতনায় লাগচে চিড়, কালোর অতল ভেদ করে—a long line of hesitating hue একটু রূপ, একটু রং, একটু রেখা, পতনোন্মুখ কালোর বহির্বাস গেল ছিঁড়ে, আলোর বন্যা ক্রমশঃ ছাপিয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল, আকাশে, বাতাসে, দিকে, দিগন্তরে। একটা rapid series of transitions এর মধ্যে কবির কল্পনায় অনুপম ভাষায় চিত্র অংকিত হ'ল এই জ্যোতির্ময় উন্মেষের। এক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ শুধু বৈদিক কবিদের সার্থক উত্তরাধিকারীই নন, সেই যজ্ঞহুতাগ্নিকে নবতম ও পূর্ণতম রূপ দিয়েছেন তিনি। আলোর সাধনা আর অমৃতের সাধনা এক হয়ে গেল ঋষির অনুভূতিতে। যারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে মৃত্যু তামসীর তাণ্ডবী লীলা। ছিন্নমস্তা, বগলা হবেন অমলা কমলা। মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, অপূর্ণতা। সেইজন্য প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে, সেই মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী দাঁড়াবে কে বজ্রের আলোতে। কে হবে মহামৃত্যুঞ্জয়ের উপাসক, যে শিবকে ফিরিয়ে এনে শিব করবে। প্রাণের অন্নময় ভূমি থেকে যে বিদায় নিয়েছে তাকে যমের অর্থাৎ নিয়মচক্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞানময় আনন্দের ভূমিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করার যে সাধনা সেই হচেচ সাবিত্রীর তপস্যা। অশ্বপতির যোগ এই শক্তিকে ধরায় নামিয়ে এনেছিল বিশ্বমানবের আর্তিহরণের জন্য—A world's desire compelled her mortal birth.

কে হবে সেই শক্তির লীলাসহচর 'A Playmate in the mighty mother's game.' ঐ ধারার উপযুক্ত বীর্যবান্ বাহক ও আধার কে—যে নিজে সত্যবান্—অর্থাৎ সত্যে বিধৃত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার পূর্বে তার নিজের রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ তার রক্তে রয়েছে খণ্ডের বীজ, যতক্ষণ না সাবিত্রীর শক্তি সেই মৃত্যুকে অতিক্রম করছে ততক্ষণ ঐ মৃত্যুর দ্বার ছাড়া রূপান্তরের সম্ভাবনা নেই—Death is a Passage মৃত্যুই চলে, মৃত্যুই চালায়। মৃত্যু তীর্থে স্নান করিয়ে রাত্রির গহিনে ডুবিয়ে তাই সত্তাকে পরিবর্তিত করে নিতে হবে এবং একমাত্র পরাশক্তিই সেই সাহায্য করতে পারেন। • তাই সাবিত্রীর সঙ্গে সত্যবানের মিলন cosmic necessity, তাই এই যোগ সাধনায় মন্ত্র-তন্ত্র আচার-বিচার বাহ্যানুষ্ঠান যাগযজ্ঞ হোম হুতাশন বড় নয়। অগ্নিময় পক্ষ বিধুনন করে মানবাত্মা একাগ্রমুখী হয়ে আরও আরও তর্কের আস্পৃহায়, চলেছে, 'Without care for time, without fear for space surging out purified,—তার জন্য চাই একটি শুচি শুভ্র পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন, আলোর কমলদলের মতো আত্মউন্মীলন। সারা জীবন হয়ে উঠবে প্রেম, প্রেম হবে প্রণাম, প্রণাম হয়ে উঠবে গান, আর সেই গান সমাপ্ত হবে নীরব পারাবারে, শুধু বেদনার পাত্রই ভরবে না—Integrated সত্তার পাত্র ও রূপান্তরিত হয়ে ভরে যাবে অপূর্ব অমৃতে, এই পরিপূর্ণ জীবনের জন্যই এই পরিপূর্ণ যোগ। তাই রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম জানাতে গিয়ে বলেছিলেন—

আছো জাগি পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন

প্রত্যেক মানুষ সেই পরিপূর্ণতার জন্য জেগে থাকবে এই তাঁর সাধনা—A divine life in a divine body. তাঁর কাব্য সেই অভীপ্সারই ছন্দময়, বাঙ্ময়, বাণীময, গীতিময় পরিচয়।

So the light grows always.

পঞ্চদশ উল্লাস

মধ্যযুগীয় সাধু ও সন্ত কবি দাদুর মুখে একদিন শুনেছিলাম—

জ্ঞানলহরী জঁহ তেঁ উঠে বাণী কা পরকাশ
অনভব জঁহ তেঁ উপজৈ সবদ কিয়া নিবাস
জঁহ তনমন কা মূল হৈ উপজৈঁ ওঁকার
তঁহ দাদূ নিধি পাইয়ে নিরংতর নিরাধার।

জ্ঞানলহরী যেখানে ওঠে সেখানেই তো বাণীর প্রকাশ
যেখানে অনুভূতি থেকে অনুভূতিতে আসি সেইখানেই তো শব্দের নিবাস
সেই তনু আর মনের মিলে যেতে পারলেই জাগ্রত হন ওঙ্কার
দাদু সেইখানেই সবচেয়ে বড় নিধি পেয়েছে যা নিরন্তর নিরাধার।

শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী" পড়তে পড়তে প্রায়ই এই কথাগুলি মনে পড়ে—আমাদের দেশে আমরা কবিকে বলি মনীষী অর্থাৎ বাক্যবিন্যাসে ছন্দে গানে রূপে প্রতিকৃতিতে তিনি যা বলছেন যা বর্ণনা করছেন তা সম্পূর্ণভাবে এসেছে তাঁর জ্ঞানে তাঁর ধ্যানে, মননে নিদিধ্যাসনে—তাঁর কাব্যের প্রতিমূর্তিগুলি শুধু বাক্যের বিন্যাস নয়, রচনার শৈলী নয়, ভাবের অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা নয়, অনুভূতিতে প্রাপ্ত সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়ার দ্বারা পেতে হয়"। শ্রীঅরবিন্দের মূলে এই কথা— The measure of a man is..by what he becomes."

"মাথায় জটা ধারণ করলে, গায়ে ছাই মাখলে বা মুখে এই শব্দ উচচারণ করলেই সোঽহম্ সত্যকে প্রকাশ করা হল, এমন কথা যে মনে করে সেই অহংকৃত"—

কিন্তু সব অগ্রগমনের মূল হচ্ছে আস্পৃহা—এই আস্পৃহাকে বৈদিক ঋষিরা বলতেন অগ্নি—এগিয়ে নিয়ে যায় 'অগ্রম্ নয়তি অগ্রণীঃ'——সেই অগ্নিই আমাদের পুরোহিত। তাই ঋষিকণ্ঠে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত রণিত হল—সত্য বাণীসমূহের অন্তরঙ্গ শ্রোতা হও, উচচারিত মন্ত্রের উত্তর দাও, প্রতিধ্বনি কর, ব্যক্ত কর, উচচকণ্ঠে ঘোষণা কর।

এই ঘোষণাই আমরা পেয়েছি শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠে 'সাবিত্রী'তে, অশ্বপতির কাহিনীতে রূপকচ্ছলে। অশ্ব হচ্ছে প্রাণ, পৌরুষ, তেজ, গতি—এসবকে সম্যক্ আয়ত্ত করেছেন যিনি তিনিই অশ্বপতি। বৃহদারণ্যকের প্রবুদ্ধ প্রবক্তা বললেন "ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরীক্ষমুদরং——নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো বা মাংসানি --- বাগেবাস্য বাক্———

উষা এই যজ্ঞীয় অশ্বের শির—সূর্য তার চক্ষু, বায়ু তার প্রাণ, বৈশ্বানর তার তেজ, আবর্তনশীল কালচক্র তার সংবৎসর বা আত্মা, স্বর্গ তার পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ তার উদর..নক্ষত্র তার অস্থি, আকাশ তার দেহমাংস..বাক্যই তার বাক্। এই রূপক কল্পনার মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তির রূপায়ণ দেখছি, যোগক্ষেম মানুষকে এরই অধিপতি হতে হবে—তিনিই অশ্বপতি—শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষায়—Higher Vital-এর অধীশ্বর—তিনি প্রাণময়ী চেতনার অধিপতি—কিন্তু এই স্তরে ওঠাই শেষ কথা নয়—অশ্বমেধ যজ্ঞও করতে হয়—কেন না

Untill the highest is gained.

শুধু তুঙ্গাভিলাষী নয়, শেষশৃঙ্গে তুঙ্গী হতে হবে। মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি সোনার শিশু (The golden child)। মহাপ্রকৃতির কাজ হচ্ছে তাকে জাগিয়ে তোলা, আর তার জাগরণকে নিয়ন্ত্রিত করা—

"To evoke, To give it form is Nature's task".

যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটে ওঠে, বিকশিত হয় বর্ণে গন্ধে সৌষ্ঠবে শ্রীতে, যেমন করে বালগোপাল হন নওলকিশোর—কিশোর হন রূপযৌবন বীর্যশৌর্যমণ্ডিত যুবক। যোগভোগ তখন একত্রই ধর্ম— সে ভোগ স্থূল আধারে শুধু ভোগ নয়—ভোক্তা মহেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে ভোগ। নিজেকে জানা মানেই আত্মার স্বরূপকে জানা, সত্যিকারের জানতে পারলেই সত্যিকারের ভালবাসা আসে। ভালবাসা এলেই মনে হয় যেন একটা আশ্রয় হল, আলয় হল—মহালয়—মনে শুধু স্ফূর্তি

আসে না, আসে শক্তিও—আমি একা নই, আমার দোসর আছে, আমার প্রিয় আছে, প্রিয়া আছে, অবলম্বন আছে, তখনই মন–আনন্দে বিচ্ছুরিত হয়—সংকল্পের প্রবেগ আসে, তন্ময়, চিন্ময় করে দেয়।

কালো থেকে আলো যাবার সুড়ঙ্গটি কেটে দেন প্রকৃতি, প্রাণ-পুরুষ হচ্ছেন সেই বেগবান্ অশ্ব—তাকে যথেচ্ছ চালাবার ও সংযত করবার বল্গা মানুষের হাতে। আর রাত্রি থেকে দিন, কালো থেকে আলো, এ উপমা তো বৈদিক যুগ থেকে আজকের শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রচলিত।

ওরে মন খুলে দে মন যা আছে তোর খুলে দে
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে।

মানুষের জয়যাত্রার আন্তর ইতিহাস যেমন লিপিবদ্ধ হয়েছে সাবিত্রীতে, তেমনি মহাভারতের সেই প্রাচীন কাহিনীকে কেন্দ্র করে মানুষের উর্দ্ধারোহণের সঙ্গে, মহাশক্তির অবতরণের কথাও গ্রথিত হয়েছে—অশ্বপতির যোগে যে গল্পের সুরু সাবিত্রীর মৃত্যুজয়ে তার শেষ। সে জয়ের জন্য চাই নিষ্ঠা, চাই প্রেম, চাই সাধনা, চাই সত্যে আগ্রহ। সত্যবান্ তিনিই যিনি সত্যে বিধৃত।

মানুষ গড়ার কাজে প্রকৃতির হাতিয়ার ছিল তিনটি—এই তিন ভৃত্যের গল্প বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ 'সাবিত্রীর' দশম পর্বের একটি অনুবাকে

A dwarf of three-bodied trinity washer serf

একটি খর্বাকৃতি বামন—(অর্থাৎ তার stature-টি বড় নয়) কিন্তু সে তিন রূপে বর্তমান—মানুষকে সাহায্য করে সে। প্রথমটি হচ্ছে আমাদের চিরদিনের অভ্যাসের শৃঙ্খল—অর্থাৎ মনের 'static' অবস্থা—নিশ্চল—স্থাণু মনোভাব—দরকার কী—যা চলছে চলুক না, আমার বাপ-পিতামহ যদি এইভাবেই সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন, আমার কী এতো মাথা ব্যথা নতুন পথে গিয়ে, তার সঙ্গে আছে এইভাব যে আমি এমন কি কেষ্টবিষ্ণু স্বয়ম্ভুশূলী হয়েছি যে নতুন করে ভাববো, নতুন করে কল্পনা করবো, নতুন করে সৃষ্টি করবো ; সত্য জিনিসটা কি—না যা আমি বুঝি, আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা, যা আমার Conventional মন স্বীকার করে নেয়,

যা আমি শুনি কান দিয়ে, যাকে আমি ধরতে পারি দু'হাত দিয়ে, আলিঙ্গন করতে পারি সমস্ত শরীর দিয়ে অর্থাৎ

Only what sense can grasp seems absolute

নড়নচড়ন রহিত এই যে মনের অবস্থা, এতো আসলে উন্নতির পরিপন্থী। সাধ করে কী ইতরার পুত্র মহীদাস বলেছিলেন—চলো, চলো, এগিয়ে চলো, হে শ্রান্ত রোহিত, ঘুমিয়ে থেকো না।

A huge inertness is world's defence

এটা একটা কৈফিয়ৎ—এ ভৃত্য পুরাতনপন্থী।

কবি শ্রীঅরবিন্দের উপমা হ'ল

In a new dress the old resumes its role
The Energy acts, the stable is its seal
On Shiva's breast is stayed the enormous dance.

স্থাণু প্রবীণ মন শুধু বাইরের বস্ত্রই বদল করলে, কিন্তু অন্তরের স্থাণুত্ব ঘোচালে না, সে তার পুরোনো সুরেই সা রে গা মা বাঁধছে। শক্তির কাজ সুরু হলো বটে, কিন্তু শক্তিকে যিনি ধরেন, শক্তিধর যিনি, যিনি গঙ্গাধর, তিনি যদি চুপ মেরে যান, তিনি যদি অনড় হ'ন,—তাঁকে জাগাবে কে? তাঁকে জাগাতে পারেন তিনিই যিনি মহাপ্রকৃতি মহাশক্তি—তাঁর বুকের উপর নৃত্যের তালে তালে নটরাজকে জাগিয়ে তুলে—স্তব্ধ পশুপতি জেগে উঠলেই শিব সদ্যোভব ময়স্কর হ'ন না, তাঁরও তাণ্ডব রুদ্ররূপ আছে। ভয়ঙ্করের বেশেই যে রুদ্র আসেন, তাঁর শংকরত্ব যে তাতেই নিহিত। পরিপূর্ণ পরম শিব, যিনি অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ, তাঁর স্বরূপ জানতে গেলে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। জীবনমানের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে—

A hunch back rider of the red wild ass

সে কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ—কিন্তু গর্দভাসীন—আবার সে গর্দভ পালিত গর্দভ নয়, বন্য ও রক্তবর্ণ। এই রূপক কেন গ্রহণ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ?

প্রথম ভৃত্যটি ছিল একেবারে অনড়—এটি তার চেয়ে ভালো, এর একটু গতি আছে। কামনার শতবহ্নি জ্বালা নিয়ে মানুষ চলেছে—এই যে চাওয়া এর মধ্যে আছে বেগ আর আবেগ—আমি যখন কোন জিনিসকে কামনা করি তখন তাকে পেতে গেলে মন আর দেহ দুটোকেই চলমান করতে হয়, বুঁদ হয়ে বসে থাকলে চলে না। সেইজন্য কামনাবাসনারূপী ভৃত্য বন্য হোক বা পণ্য হোক, কানা মামা হলেও নেই মামার চেয়ে ভালো। আর আসলে সব কামনাই সেই বিশ্ববাসনার অন্তর্ভুক্ত, তারই ছন্দের সঙ্গে যুক্ত।

A half intuition purpled in its sense
It threw the lightning's fork and hit the unseen
It saw in the dark and vaguely blinked in the light
Ignorance was its field, the unknown its prize.

কবির উপমা হলো—সাধারণ কামনা-বাসনাগুলিও শুধু অজ্ঞান নির্জ্ঞান মনের কাজ নয় তার মধ্যেও সত্যজ্ঞানের, সত্যকামনার আভাস থাকে, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সেগুলি অচ্ছেদ্য। কামনার শত লহর যেন বিদ্যুতের সর্পিল গতি—তার চঞ্চল জিহ্বাবলি লক্ লক্ করে—এর সঙ্গে অজ্ঞানের অন্ধকারের সজীব সংযোগ, মাঝে মাঝে তড়িৎশিখার আলোয় নিবিড় কালো অজ্ঞানের মধ্যেও সত্যের একটু সন্ধান থাকে, যদিও অজ্ঞান মনোভূমিই এর ক্ষেত্র, অজানা লাভই এর পুরস্কার।

মানুষের তৃতীয় কামনভৃত্যটি হচ্ছে—Reason বা যুক্তিবাদী মন বা বুদ্ধির (বোধির নয়) মাপকাঠিতে বিচার বিশ্লেষণ। পুরাণী কথায় শ্রীঅরবিন্দের মতে—Reason is like an advocate who accepts every brief and being open to all thoughts, She is unable to know.

কিন্তু মন, উকীল হলেও ভুল করে, তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হল যে দুয়ে দুই যোগ দিলে চার হয়, কিন্তু পাঁচও হতে পারে। বুদ্ধির নিকষে যেমন সব সত্য ধরা পড়ে না তেমনি নয় ক্যারেট সোনাকেও পাকা সোনা বলে বাজারে চালিয়ে দিতে পারা যায়। আসলে বুদ্ধি দিয়ে টীকাভাষ্য করে মহাপ্রকৃতির লীলাকে কিছুটা বোঝা অসম্ভব নয়

কিন্তু সবটা ধরা যায় না। তার জন্য দরকার "“Intuitive mentality”—বোধি চেতনা—এবং শ্রদ্ধা, প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন। তবেই পূর্ণাঙ্গ নিটোল অখণ্ড সত্য, চেতনার সিসমোগ্রাফে ধরা পড়ে।

আমরা যখন রিসার্চ, এক্সপেরিমেণ্ট্, ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ গবেষণা, ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রভৃতি সূত্র দিয়ে ঘটনাবলীকে ধরতে চাই তখন যে চিত্র পাই সেটা হচ্ছে আংশিক চিত্র। ধরুন আইসবার্গ বা সমুদ্রে ভাসমান বরফের চাঁই—যে অংশ on the surface সেইটেই সব নয়—জলের নীচে যেটা আছে সেটারও পরিমাপ দরকার।

এই প্রসঙ্গে কবি শ্রীঅরবিন্দ একটি অপূর্ব সত্যকে তুলে ধরলেন

A touch can alter the fixed front of Fate
A sudden turn can come, a road appear
A greater Mind may see a greater Truth,
or We may find when all the rest has failed
Hid in ourselves the key of perfect change
Ascending from the soil where creep our days
Earth's consciousness may marry with the Sun
Our mortal life ride with spirits wing
Our finite thoughts commune with the Infinite.

একটি পরশে মানুষের স্থির নিয়তির নির্দেশ বদলে যেতে পারে, লালাবাবু বদলে গেলেন এক কলি গান শুনে, বিল্বমঙ্গলের মন ঘুরলো রমণী-প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে। তাছাড়া মন যত বৃহত্তর মহত্তর সমৃদ্ধতর হবে, ততো পূর্ণতর সত্যের সন্ধান পাবে এতে আর বিচিত্রতা কী। তাছাড়া মানুষের নিজের দেউলেই বেদ্য দেবতা বসে, চাবী নিজের মধ্যেই—দেহই যে দেবালয়—মাটির চেতনাই উর্ধ্বগামী হয়ে সূর্যসঙ্গমে মেশে।

কালিদাসের কুমারসম্ভবে গৌরী প্রথমে মহেশ্বরকে ভোলাতে গিয়েছিলেন রূপে, রংএ, বর্ণে বৈভবে—বসন্তকে সখা করে, মদনকে আশ্রয় করে। বর্ণনাটি স্মরণ করুন—সমাধিমগ্ন নীললোহিতকে জাগাতে চলেছেন জগজ্জননী—লৌহবৎ অয়স্কান্তেন—সহায় কে, না স্বয়ং রতিপতি,

প্রাঞ্জলি পুষ্পধন্বা..ললিতযোষিদ্ভ্রূলতা-চারুশৃঙ্গং রতিবলয়পদাঙ্কে চাপ-মাসজ্য কণ্ঠে—সঙ্গে কে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি' ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গদেবতা। কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা,
ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ-তরুণী
বকুল বনে পবন হত সুরার মত সুরভি
পরাণ অরুণ বরণী।

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা উমা এগুলেন, পদ্মবীজের মালা দিলেন, মহেশ্বর চঞ্চল হলেন বটে কিন্তু চক্রীকৃত চারুচাপের চক্রান্ত ধরে ফেললেন এবং শেষপর্যন্ত 'ভস্মাবশেষং মদনং চকার'। নিখিল বিশ্ব ভরে রতিবিলাপ উঠল, কিন্তু অতনু আবার তনু নিয়েছিলেন বীরের তনুতে। এবারে অবশ্য পার্বতী রূপ দিয়ে ভোলান নি, অরূপ দিয়েই—সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ, কিন্তু কি কালিদাস, কি রবীন্দ্রনাথ, কি শ্রীঅরবিন্দ তিন মহাকবিই স্বপ্ন দেখলেন যে জীবন হবে পরিপূর্ণ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিচিত্র সমন্বয়।

তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে, দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান মাঝে উমার ভৈরবী

ভৈরবের ধ্যান আর ভৈরবীর সুর যখন মেশে তখনই পরিপূর্ণ মিলনের উৎসব আসে। আদিরসের পিছনে আছেন আদিমতম যিনি—তাই প্রেমের অবিস্মরণীয় ধ্যান মূর্তির জন্যই ভস্ম অপমান শয্যা ছেড়ে পুষ্পধনুকে রুদ্রবহ্নি হতে জ্বলদর্চিতনু নিয়ে জাগাতে হয়। মৃত্যুর দেবতার হাত থেকে তপস্যার অমৃতত্বকে ছিনিয়ে নিতে হয়। তাই যুক্তিতর্কের জগৎ হচ্ছে

Interim report of a traveller towards the half
found truth in things

কিন্তু মানুষের অনন্ত আশা, অনন্ত কামনা, সে অর্ধসত্যে সন্তুষ্ট নয়,

Yearning for the straight paths of Eternity

তার নিদ্রাহীন চক্ষু খুঁজছে সেই সোজা সরল ঋজু পথকে, কল্পনা করছে সেই মহতী প্রাপ্তির, কিন্তু আমাদের মানুষী মন ত সীমায় বিধৃত—প্রবাহন যা বলেছিলেন দালভ্যকে—সাধনায় উঠতে উঠতে এমন এক স্তরে পোঁছানো যায় যখন এই অনাদ্যন্তবান্ সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্যকে মন দিয়ে বুঝি ধরা ছোঁয়া যায় না, কারণ

It is greater than its earthly instrument

.. ..

Instinct with endless more than we must be.

সেই বৃহত্তর, সূক্ষ্মতর সম্ভাবনাময় জগতের হাওয়া মাঝে মাঝে এসে গায়ে লাগে আমাদের। সাধক তপস্বী কবি মনীষীরাই এর বাহক ও ধারক, তাঁরাই কখনো কখনো শুনতে পান সেই নূপুরগুঞ্জরণ, সেই অনাহত ধ্বনি। সেই পুরোনো স্মৃতি আমরা ভুলে গেছি, ডুবে গেছি বর্তমানের অজ্ঞানতায়, কিন্তু মাঝে মাঝে এই চেতনাও আসে

Amidst Earth's mist and fog and mud and stone
It still remembers its exalted sphere

এই ধূলোকাদা মাটি ছায়া কুয়াশার মাঝখানে জাতিস্মর মানুষের মন অনির্বাণ অগ্নিশিখার দিকে চেয়ে আছে—সে যে মায়ের ছেলে, মায়ের ঘরে ফিরে তাকে যেতে হবে—যতই সে পথ হারাক্, যতই তার স্মৃতি মুছে যাক্, যতই কান্নাকামনা আশা-আকাঙ্ক্ষায় সে অধীর হোক্,—তার ঘনান্ধকার তিমির অমারাত্রির শেষ হবেই, সে হচ্ছে পরমের উত্তরাধিকারী, এই তার জন্মগত স্বত্ব, মানস সত্তার উর্ধ্বে এক সত্তায়

Heir to delight and immortality

সেই সত্য নিরঞ্জন, শুদ্ধ, হিরণ্যগর্ভ তাঁকে ডাকছেন, তার শ্যামশ্যামা আসছেন, শিবশিবানী দুলছেন—

ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসিকে সে দেখবে, সে জানবে, সে বুঝবে, সে শুনবে, সে হবে! এই তার অতীত, তার বর্তমান, তার ভবিষ্যৎ। মানুষকে এত বড়ো আশার বাণী শুনিয়ে গেছেন যে কবি ও সাধক—বৃহত্তর স্বপ্নের সন্ধান, মহত্তম চেতনার নবদীপ্তি—'Greater Dawn'—তিনিই শ্রীঅরবিন্দ। আমার দেবতা নেয় তোমাদের সকলের নাম—

হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা

কিন্তু মনের ভাষায় তা উচচারিত হয় না, মনের চিন্তায় প্রকাশ পায় না। মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে করতে হবে শাশ্বতের জ্যোতি, তার প্রতি অঙ্গে অনুভব করতে হবে চিন্ময়ের স্পর্শ। এই পার্থিব জীবনই হয়ে উঠবে দিব্য জীবন। অন্তরের পশ্যন্তী বাক্ মন্ত্রেরই কাজ করে। জীবনে জন্মান্তর, রূপান্তর গোত্রান্তর করে দেয়, কারণ

শ্রীঅরবিন্দে অন্য একটি বড় কবিতা মনে পড়ছে, তার ভাবার্থ হচ্ছে—

আমি বিরাট্
তরঙ্গ চুম্বিত সমুদ্রের মহিমার চেয়েও বৃহৎ ও মহৎ
ভাগবততেজের দুর্নিবার ঝড় আমি,
আবার বাতাসে কাঁপচে ঐযে ফুল
বৃক্ষশাখায় দুলচে ঐযে বেতস তরুলতা, ক্ষণভঙ্গুর
তাদের চেয়েও দুর্বল আমি।

আমি সকল কালের সকল গুণীর সকল জ্ঞানের ভাণ্ডারী
অথচ আমার প্রকৃতিতে সব সঞ্চয়ই নিবিড়ঘন অজ্ঞানের,
তারও কাণ্ডারী আমি,
যখন আমি লাস্যে হাস্যে মধুর কামনায় নরক নৃত্যে মাতি,
তখনও আমার দৃষ্টি কিন্তু চলে যায় ন্যায় ও নীতির
প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখার দিকে
আমার মন কখনো পূর্ণ উদিত চন্দ্রের মত প্রোজ্জ্বল বিকশিত
কখনো তিমির অমানিবিড় গহ্বরের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবরে মত

যুগযুগান্তরের বীর্য ও ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী যে আমি,
সেই আমিই আবার অমিতব্যয়ী
হারিয়ে ফেলি সত্য ও অমৃত রীতি
দুই বিপরীতের স্মৃতি মিলেছে আমার সত্তায়।
বারে বারে প্রাণের পরম প্রাচুর্যে নিত্যজায়মান আমি
মৃত্যু দেবতার তন্দ্রাকে করি আঘাত, করি চমকিত
আবার সেই আমিই অনন্তের পথে অন্তবান্‌।

I am greater than the greatness of the seas
A swift tornado of God-energy :
A helpless flower that quivers in the breeze
I am weaker than the reed one breaks with ease.

I harbour all the wisdom of the wise
In my nature of stupendous ignorance
On a flame of righteousness I fix my eyes
While I wallow in sweet sin and join hell's dance.

My mind is brilliant like a full-orbed moon,
Its darkness is the caverned troglodyte's.
I gather long Time's wealth and squander soon
I am an epilome of opposites.
I with repeated life death's sleep surprise ;
I am a transcience of the eternities.

(Sri Aurobindo—Last Poems
Man, the Despot of Contraries
29. 7. 40)

কবি আরো বললেন অন্যত্র—(The Meditation of Mandavya)
আমি জানি, ওগো দেবতা
সেদিন আসবে যেদিন
প্রভাত তপনের অরুণ রক্তিমায়
মানুষ আবার জাগবে, উঠবে

কাদার খেলাঘর ছেড়ে ;
নূতন করে গড়বে সূর্য তারা চন্দ্র'
অতন্দ্র, সৃষ্টি পাবে নূতন দৃষ্টি
নূতন বেদ, নূতন বিজ্ঞান, নূতন বিধান
বেদনা ব্যবধান যাবে দূরে
নির্বাসিত হবে পৃথিবী থেকে
মৃত মরু কান্তার, ফুটবে গোলাপ
মানুষ হবে দেবতার সত্য প্রতীক।
মূর্চ্ছাহত আমি হবো না
জানি আছে আমার তৃষ্ণা,
তনহা রাক্ষসী আছে বসে,
কিন্তু পিপাসার জলও আছে কোথাও
হয়তো এ জীবনে পাবোনা সে সন্ধান
পুরানো প্রকৃতি বসে আছে পথের ধারে
প্রেতিনীর মত,
পুরাতন কাম কামনা বঞ্চনার প্রবৃত্তি, সন্দেহ,
কিন্তু এরও পারে আছে অন্য জীবন
এধারে ও ওধারে তৃপ্ত করবে যা আমাদের ?
হে নাথ, আমি ধৈর্য ধরে থাকবো ;
কোথায় সেই প্রেম, যা আমি পাইনি ?
আমি কল্পনা করেছি আকাশে বাতাসে
দ্যাবা পৃথিবীতে এক মহান্‌কে,
দেখতে চেয়েছি তাঁকে পল্লব-মর্মর প্রতিটি পত্রে
শুনতে চেয়েছি তাঁর স্বর কলস্বনার সুরে-সুরে,
ভীত হয়েছি তাঁর রুদ্র রূপ দেখে
বিদ্যুৎবাহিনীর জটিল জটায়
নিশীথিনীর চিরস্তব্ধতায় তাঁকে ধরতে পারিনি
তাঁর পানে জাগেনি আমার চিত্ত
যখন প্রতিটি উষার উদয় দিগন্তে বারেবারে
ফিরে আসে কনককান্তি জ্যোতিষাং জ্যোতিরবিত্ত,
আর এখন কিনা বলি—নেই, তিনি নেই
আছে শুধু এক মূক শূন্যতা, বোবা বিবস্বান্‌।

কে বলছে ভগবানের কথা ?
ঝোপের আড়ালে খিদেয় পাগল একটা পশু বসে আছে
গিলে ফেলতে চায় এই পৃথিবীটাকে,
তাতেও তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নেই মোটেই,
সে আমাদের সৌন্দর্যকে করেছে টুকরো টুকরো
আমাদের শক্তিকে করেছে খান্ খান্
মধুরতম স্মৃতির ক্ষণগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন
গায়ের মাংস খুবলে খাচেছ, দুঃশাসনের মত রক্তপান,
চোখের জল পর্যন্ত শুষে নিচেছ, যেন বনে বসে আছে
ওৎপেতে বছরের পর বছর।
তুমি কি চাও, যে আমার শেষ অহং এর মালাটি
তোমার ডালায় ভরে দিই, বেশ তাই নাও, খুশী হও,
আমার অন্তিম আনন্দটুকু হরণ করতে চাও, করো, ছেঁড়ো
তার অন্ত্যেষ্টি হোক্,
কিন্তু একটি জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ো,
মৃত্যুকালে, মরণপারাবারের ধারে যেন দেবতা,
শুনতে পাই তোমার ঐ মন মাতানো স্বর
সখা বলে নাই বা গ্রহণ করলে, শত্রু ভাবেই করবো ভজনা
ঐ টুকুই ছলনা শুধু প্রভু;
শত্রু হও, মিত্র হও, প্রিয় বা হন্তা, তোমায় আমি চাই,
শুধু তোমায়, ঐ আমার প্রয়োজন
ওগো আমার ব্যক্তিগত সত্তার অনন্তময়তা।

* * * *

যা কিছু দিয়েছো তুমি, কেড়ে যদি নিতে চাও, নাও
সরিয়ে নাও তোমার ঐ রূপে রূপে প্রতিরূপ প্রতিচছায়াগুলি
তোমার নিজের হাতে গড়া সত্যকে অস্বীকার করো,
কিন্তু কী দিয়ে বদল দেবে ?
তোমার ঐ শূন্য কি ধরা দেবে আমার বাহুবন্ধনে,
ঊর্ধ্বযাত্রী সত্তা কী কূলহীন শূন্যতার নামহীন সীমাহীনতায়
থাকতে পারবে ? প্রেমের সত্যিকার জ্বলদর্চিশিখা
কী তার আগুন হারিয়ে বিনোদন শক্তি ধরে রাখতে পারে ?

হয় তুমি করছো ভুল, না হয় প্রকৃতিরই দূরদৃষ্টির অভাব ;
মরতার স্তব্ধ নৈঃশব্দের পেছনে এমন কী জীবনের উল্লাস
যার জন্য ব্যাকুল হয়ে তুমি আকুল চিত্তে ডাকছো — 'ওরে আয়
শব্দ নেই, নৈঃশব্দ নেই, ধরণী নেই, শূন্য নেই
আছে শুধু চেতনার অতীত নির্বিকার নিরঞ্জন এবং
অনেক নাম নেই যার, তবু যিনি নন অনামী
বহুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অথচ যিনি এক
অতীন্দ্রী আনন্দময় যিনি, যখন কাল ও আকাশ
মহাশূন্যে মহতী তন্দ্রায় ঘনীভূত নিদ্রায় সুপ্ত মূর্ছিত সুষুপ্তিতে

* * * *

স্তব্ধতায় আমার এসেছে অবসাদ,
এসেছি বিদায় নিয়ে নিবিড়তর রাত্রির কাছ থেকে,
যা কিছু বৃহৎ মহৎ, সব কিছু স্থান নিয়েছে
আমার দুরন্ত জাগ্রত সত্তায়,
উর্ধ্বে বিলীন আকাশের চূড়ায় চূড়ায়
পক্ষ বিস্তার করে,
তাদের সংখ্যাগণনার অতীত বাক্
অপেক্ষায় রত বিরাট্‌কে চমৎকৃত করেছে
লক্ষ লক্ষ অগ্নিফণা এক শিখাহীন দ্যুতিহীন
আলোক মালিকায় মিলিয়ে যাচেছ।

আবার তাঁর চেতনায় রূপকল্পে জাগছে—একে কবি কল্পনার বিলাস বা সাধনলব্ধ অতীন্দ্রিয়দর্শন যাই বলি না কেন, কাব্যচেতনায় এর বিরাটত্ব অপরূপ ব্যঞ্জনায় বলিষ্ঠ।

শূন্য শূন্য বিরাট শূন্য, দ্যুলোক ভূলোক ব্যেপে
মৌনশূন্যতা
যার সংকোচন প্রসারণে
উদ্গীরিত হচ্চে ক্ষণে ক্ষণে
সংখ্যাগণনার অতীতরূপ রং রেখা
কতো বিভিন্ন আকৃতি ব্যাপ্তিতে প্রকৃতিতে
এই নিরানন্দ শূন্যতায়।
যদি সত্য হয় এই স্বপ্ন
এই লৌহ বিশালকায় দানব অসহায় ক্রীড়নক
যাকে আমরা নাম দিয়েছি পৃথিবী
যেটা ভ্রাম্যমাণ ঘুরছে, ঘুরছে
ধাক্কা খাচ্চে, করছে চীৎকার
এই রক্তাক্ত মেদিনী
যা থামতে পারেনা,
ইস্পাতসম যূপকাষ্ঠে বদ্ধ বলির পশু
কালচক্রযানের ঘূর্ণীতে
ভগ্ন বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত।
যদি বলো এর সৃষ্টি কর্তা
এক অতিমানুষী সত্তা
তবে জানিনা, কি দুর্নামে
করবো তাকে অভিহিত
অত্যাচারী ভগবান্,
শক্তিমান্ দুর্দম একনাথ
সমস্ত সৃষ্ট জীব মুখর হোক
তার তীব্র নিন্দায়
প্রখর নখর হয়ে বলুক ধিক্‌ধিক্
মানিনা তোমায়, চিনিনা, জানিনা
ঘর্ণিত হোক্ সৃষ্টি, রসাতলে
যাক্ ধরাতল
সম্পূর্ণ অস্বীকৃতিতে লুপ্ত সুপ্ত
হোক্ এই তৃপ্তিহীন

আনন্দহীন ভুবনমণ্ডল।
সৃষ্টি এবং স্রষ্টা দুই ই হোক বিলীন
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, তারায় তারায় কোথায় ভালবাসার চিহ্ন
কোথায় অপ্রমত্ত প্রেমের স্পন্দন
জীবন কি শুধু একটা ধাপ্পাবাজী না প্রহসন
যা উন্মোচিত করে
নব নব যন্ত্রণার দ্বার
নিবিড় দুঃখ হয় আরো ঘনীভূত
না, এতো প্রেমের অমৃতলোক নয়
এ যে ছদ্মবেশী মৃত্যুর নিয়তি
যা করছে গ্রাস ধীরে ধীরে এই ধরিত্রীরে
কালো যবনিকার অন্তরালে মুখ করি ব্যাদান
নৃশংস ধরার এই তো ছবি নির্মম বর্বরতার।
চেয়ে দেখো দেবতা, আমি মানুষ, করছি তোমায় অভিসম্পাত
অস্বীকার করছি তোমার প্রেমকে অস্তিত্বকে
হে দণ্ডধর তোলো দণ্ড, হানো বজ্রশেল বাজুক দুন্দুভি
মুষলে পেষণ করো, শাস্তি দাও শাস্তা
আমাকে জানতে দাও বুঝতে দাও বলতে দাও—
যে তুমি আছো, তুমি আছো।
আমাকে করোনা ত্যাগ ঐ মূক বার্তাবহদের কাছে
ওদের নেই প্রাণ ওদের নেই আক্রমণ ক্ষমা ধৃতি
ভালোবাসার অবিশ্বাসে ওদের উত্তেজনা নেই
আঘাতের পর আঘাতে ওরা উল্লসিত নয়
ওদের মধ্যে নেই সে মনন যা বলতে পারে
আমি জেনেছি, আছে আছে হৃদয়ের স্পন্দন
অশ্রু স্তম্ভিত ক্রন্দন, বেদনার বারতা, সন্ধানের অভীপ্সা
তবু জেনো আমি সেই মানুষ যে করেছে প্রেরণ যুগে যুগে
এই বিশ্বের অগ্নিশুদ্ধ সত্তাকে এপার হতে ওপার
মর্ত্য থেকে স্বর্গ—

যদিও সমস্ত মানবসমাজ আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে দেয় রায়
যদিও না থাকে কোন দিগ্‌দর্শন

না যায় শোনা কোনো অতিপ্রিয় বাণী
তবুও বলবো আমি জানি, আমি শুনি তার পায়ের ধ্বনি
আগমনীর গীতিকিঙ্কিণী, সে আসছে, সে আসছে
আমার ক্ষতস্থানে প্রলেপ বুলিয়ে দিতে
দুর্বিনীত মনকে করতে শান্ত,
আমি আবার করতে পারবো ক্ষমা, আবার বাসবো ভালো,
আবার করবো দুঃখ ভোগ, হলেমই বা আবার প্রবঞ্চিত।

তাই শ্রী অরবিন্দের ধ্যানে এলো, শেষ নেই অশেষের, যে ভালোবাসে, যে ভালোবাসা পায়, তার অবসান নেই, নেই সমাপ্তির গান। এই তো "সাবিত্রী"র শেষ কথা। মৃত্যু নেই, রূপান্তরিত সত্তাই সত্য, অমর্ত্য, অমৃত, নূতন উষার স্বর্গদ্বার দেখায়, উদ্ভাসিত প্রজ্ঞায়, প্রোজ্জ্বল অরুণার্করাগে দীপ্ত। কাব্যের সুরু হয়েছিল দেবতাদের জাগৃতির পূর্বক্ষণে রাত্রির শেষ লগনে, অতিনিশায়, আলো-আঁধারির সঙ্গমে যখন জন্ম নিচ্চে নূতন দিন, নূতন মানুষ, নূতন দেবতা। আর কাব্যের শেষ হলো এই আশায় যে মহাতামসীর বক্ষ বিদীর্ণ করে জাগবেন মহত্তমা প্রত্যুষা।

"And in her bosom
nursed a greater dawn"

এই লেখকের অন্যান্য পুস্তক

বিনা টিকিটে (গল্প সংগ্রহ)—(সংকেত ভবন)
অসমীয়া সাহিত্য (আলোচনা)—বিশ্বভারতী
রাগে আর অনুরাগে (গল্প সংগ্রহ)—বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড
দুই কবি (রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ, আলোচনা)—রীডার্স কর্নার
ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা (রম্যরচনা ও ভ্রমণকাহিনী) —
রূপা এ্যাণ্ড কোং
উত্তর মেলেনি (উপন্যাস)— রূপা এ্যাণ্ড কোং
টমাস ম্যানের 'ব্ল্যাক সোয়ান' মধুর আমি নারী
(অনুবাদ-উপন্যাস)—রূপা এ্যাণ্ড কোং
Tarasankar Banerjee's The Judge (বিচারক)
(Translation)—Hind Pocket Books, Delhi
Vedanta as a Social Force—Vivekananda
Centenary Lectures etc —Calcutta University
(in the press)
শিবভাবনা—(বক্তৃতামালা)—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
(প্রকাশের অপেক্ষায়)
শ্রীঅরবিন্দের 'বসোরার উজীররা —(নাটক অনুবাদ)—শ্রীঅরবিন্দ
পাঠ মন্দির
(ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্যে)